ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
গোলাম মোস্তাকীম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোঃ শফিকুল হক

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ মোঃ শফিকুল হক

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৭

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৫ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭, ৯৩৩৬০৩৮

LOKAPRASASANA SAMAYIKI
Vol. 16, September 2000, Ashwin 1407

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Editor : Md. Shafiqul Haque

© Bangladesh Public Administration Training Center 1407

Telephone	:	7710010-15 (PABX)
Telex	:	62228 PATC BJ
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc @ bangla. net
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

সূচিপত্র

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ১
মোঃ জহুরুল ইসলাম

গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মবিঅ-এর প্রকল্পের কার্যকারিতা ২৫
বেগম রোকসানা মিলি / মোঃ লুৎফর রহমান

ঢাকা মহানগরীর পেশাঃ গতি ও বৈপরীত্য ৫৯
আনু মুহাম্মদ

বাংলাদেশে বনোজাড় ও তার পরিবেশগত প্রভাব ৮৩
ডাঃ ইসরাত হাফিজ

পরিবেশ আইনঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ৯৯
মেহেদী মাসুদ

ভাষা আন্দোলনঃ আত্মপরিচয়ের সন্ধান ১১৩
মোঃ শরীফ হাছান

সচিবালয়ে কর্মরত সিভিল অফিসারদের অবসর ও বিনোদন ১৩১
মোঃ শফিকুল হক

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মবিঅ-এর প্রকল্পের কার্যকারিতা

বেগম রোকসানা মিলি *
মোঃ লুৎফর রহমান * *

Effectiveness of Projects of the Directorate of Women's Affairs in upgrading the socio-economic condition of rural women. Begum Ruksana Mili / Md. Lutfar Rahman

Abstract : Since independence, the successive governments of Bangladesh have been introducing a lot of welfare initiatives for the women, the worst victim and deprived segment of society. In this trend, the Women Rehabilitation Board was constituted for the first time just after liberation on 18th February, 1972 to rehabilitate the war affected women. With the passage of time, the GOB efforts to rescue women from their marginal position are extended countrywide perspective. Among this efforts and institutional arrangements, Ministry of Women and Children Affairs has been emerging as the leading agency for formulating, planning, supervising, monitoring and implementing development policies, programs and projects concerning women affairs. This national machinery has now been implementing twenty-one development projects regarding poverty alleviation, awareness building, violence, employment generation, institution building through field level offices i.e. Zilla and Thana level Women Affairs Department. The focus of this paper is on the institutional arrangements and programs and their impact on the socio-economic status of target groups. The findings of this study substantiate the facts that the micro-credit programmer under project conducted by different organizations are yet to bring any radical change regarding the stereotyped marginal position women. The study also argued here that the present amount of micro-credit and its disbursement and receiving system will never be helpful to eradicate massive poverty, unemployment, illiteracy and disgraceful social and domestic position of women.

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
* * গবেষক।

বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ধারায় নারী উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক ধারণা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে নারী উন্নয়ন সমধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। ১৯৯১ সনের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১০৫.০ মিলিয়ন। এর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৫২.৪ মিলিয়ন অর্থাৎ জনসংখ্যার ৪৯% ভাগ। যদিও জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা, তবুও তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অধিকাংশ মহিলা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সীমিত। অথচ চরম দারিদ্র, বঞ্চনা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বেকারত্ব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে আত্ম-নির্ভরশীলতার নীতিতে জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাথে মহিলা সমাজের বিভিন্ন সামাজিক ও উৎপাদনমুখী কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। মোট কথা দেশের দ্রুত ও সমতাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলাদের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। বিশ্বের সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সর্বাপেক্ষা বিবেচিত জনগোষ্ঠি হচ্ছে মহিলা। গতিশীল কর্মমুখর চালিকা শক্তি হচ্ছে মহিলা শক্তি, বাংলাদেশে এ শক্তি জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ। এই সত্যকে উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর দেশের মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী তথা আত্ম-নির্ভরশীল করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা এবং পারিবারিক ও সমাজ জীবনের যে কোন কর্মকান্ডে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া, মহিলা সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের নিমিত্তে যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার মধ্য থেকে বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর উদ্দেশ্য, কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল, সমস্যাদি, প্রকল্প থেকে সুবিধা প্রাপ্ত গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়াদি

আলোচনা করাই আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রসঙ্গটিও বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্যার বর্ণনা ও গবেষণার গুরুত্ব

শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, অগ্রসরমান বিশ্বের সাধারণ চিত্রায়নে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যমুখর একটি সমাজ ব্যবস্থাই দৃশ্যমান হয় যেখানে সম্পদ, মর্যাদা, ক্ষমতা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর সুষম অধিকারের প্রসঙ্গটি অবহেলিত হয়ে আসছে। সমূহ আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে যে, এ বঞ্চনা, রাষ্ট্র, সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি অত্যন্ত সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর বস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানের উন্নতি হলেও তাদের অবস্থানগত অর্থাৎ মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জনের পথ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশস্ত হয়নি।

বাংলাদেশের মহিলারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে অনেক পশ্চাতে রয়েছে। পুরুষের শিক্ষার হার যেখানে ৫৫%, সেখানে মহিলা শিক্ষার গড় হার ৩৮.৭০%। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের যোগান যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী ১২০০ থেকে ১৫০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের যোগান দিতেও সক্ষম নয়। অপুষ্টিজনিত কারণে নারী ও শিশু মৃত্যুর হার তাই অত্যধিক। নারী নির্যাতনের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই কাজে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। মোট কথা বাংলাদেশের নারীরা বিশেষতঃ গ্রাম্য মহিলারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ, সম্পত্তির মালিকানা, মজুরী ও বেতন, প্রশিক্ষণের সুযোগ ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে নীতি নির্ধারণের সুযোগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। ফলে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলারা যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না।

যদিও গত কয়েক দশকে এসব সমস্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করার ফলে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও মহিলাদের অর্থকরী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও

সংশ্লিষ্ট নানা বিশেষ সমস্যা ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাবে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের সঠিক গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। (Mc Carth, et al., ১৯৭৮ ঃ৬)। বাংলাদেশের মহিলাদের উপর লিখতে গিয়ে ক্লে ও খান (Clay and Khan, ১৯৭৭ ঃ ২৩) বলেছেন যে, গ্রামীণ মহিলাদের অর্থকরী কাজে নিয়োগ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি ''অন্ধকারে ঢাকা'' এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৭৪ এবং পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালের জাতীয় শুমারী মহিলাদের অনেক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে 'গৃহস্থলীর কাজ' বলে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে প্রথমতঃ এ অন্ধকারকে আরো গভীরতর করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ অর্থকরী কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপারটা বৈশিষ্ট্যগতভাবে পুরুষদের অংশগ্রহণ থেকে ভিন্ন। তৃতীয়তঃ গ্রামীণ মহিলাদের প্রকৃত ধ্যান-ধারণা, আচরণ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অর্থকরী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি সম্পর্কে নানামত বা ধারণা বিশেষতঃ পুরুষদের এ বিষয়ে ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, সাধারণভাবে গ্রামীণ মহিলাদেরকে লাজুক, দুর্বল, শুধুমাত্র গার্হস্থ্য ও সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করার কাজে উপযোগী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুৎপাদনশীল বলে মনে করা হয়। মহিলাদের সম্পর্কে এ ধারণা মূলতঃ পুরুষদের কাছ থেকেই পাওয়া এবং মহিলাদের এ চিত্র চিত্রায়ণের পেছনে পুরুষদের স্বার্থ কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের সম্পর্কে খন্ডিত এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সম্পর্কে বিশেষতঃ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা যেমন-কাজের অবস্থা, আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাই গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার মহিলাদেরকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত করে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মবিঅ) সরকারের মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়নে

নিয়োজিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি মহিলা বিষয়ক দপ্তর থেকে ১৯৯০ সনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রাইভেট সেক্টর এখনও তেমন শক্তিশালী নয় এবং গণ উন্নয়ন খাতে প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা প্রশংসনীয় নয়। তাই সরকার নিজের স্বার্থে উন্নয়নের সকল খাত নিজের আয়ত্তে রেখেছে। সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে কি না, তা অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে এই সেক্টরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

এ বিষয়ের উপর পরিচালিত গবেষণা কর্মটি বস্তুতঃ পরবর্তীতে আরও মৌলিক গবেষণার পথ প্রশস্ত করবে এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় (mainstreaming) গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়ন ও কল্যাণ বিষয়ক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী একীভূত করণে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদদের সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারী উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার জাতীয় অবকাঠামো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকরী ভূমিকা পরীক্ষা করা। বস্তুতঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ অংশগ্রহণকারী নারীদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে কতটা, কিভাবে প্রভাবিত করছে, সে বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াঃ

ক) দারিদ্র্য বিমোচন, সচেতনতা বৃদ্ধি, আয়ের উৎস সৃষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গৃহীত মবিঅ এর দায়িত্বশীলতা ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;

খ) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালনার বাস্তব সমস্যা অনুসন্ধান;

গ) মবিঅ এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও স্কীমসমূহ সম্পর্কে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মনোভাব যাচাই;

ঘ) প্রকল্পভুক্ত নারীদের সঠিক জীবন-যাত্রার মানের উপর প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব যাচাই;

৬) সর্বোপরি সরকার, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণা কাজে বিভিন্ন উৎস (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তম্মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত রেজিষ্ট্রিভুক্ত সমিতির নোটসমূহ, সুফলভোগী গোষ্ঠির মতামত, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর ফাইলবদ্ধ লিখিত দলিলপত্রাদি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ এবং সংগঠনের উপর নিবন্ধসমূহ অন্যতম। প্রবন্ধটিতে "বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তব সাফল্য অনুশীলন করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকা, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রিভুক্ত সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ ও তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোভাব জরিপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত নারীই ছিল মূল উত্তরদাতা। দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া সদর থানার দুটি বেসরকারী সংগঠন নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে যে সংগঠনটিকে গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম 'বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা', কোটপাড়া, কুষ্টিয়া। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত অধিদপ্তরের রেজিষ্টিভুক্ত উক্ত সংগঠনের তিনটি ক্ষুদ্র মহিলা সমিতি, যথাঃ (১) চর আমলাপাড়া সূর্যমুখী মহিলা সমিতি, (২) হরিপুর বাজারপাড়া শাপলা মহিলা সমিতি ও (৩) মঙ্গলবাড়িয়া মসজিদপাড়া মালা মহিলা সমিতি এর ৪৮ জন মহিলা সদস্যকে উত্তরদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগী গোষ্ঠি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্ত অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহের বাস্তব ফলাফল নিরূপণার্থে সুবিধাভোগী গোষ্ঠির মনোভাব যাচাইয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি জরিপ কার্য পরিচালনাা করা হয়েছে। কখনও দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ফলাফল বিশ্লেষণ এবং বুঝার সুবিধার্থে সংগৃহীত তথ্যসমূহ শতকরা নিয়মে বিশ্লেষণ করে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট জেলার (কুষ্টিয়া) ও কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপর এ গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

নারী উন্নয়নে জিওবি'র প্রতিষ্ঠানিক উত্তরণ ও পদক্ষেপসমূহ

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশে নারীরা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিভিন্ন পশ্চাৎপদতার কারণে সন্তোষজনক নয়। অথচ নারীর স্বকীয় এবং সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের সমহারে অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি, নিরক্ষরতা, লোকাচার, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সংকুচিত সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারার (mainstreaming) সাথে মহিলাদের একীভূত করার (integrate) পথে বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করছে। এ সকল পশ্চাৎপদতা থেকে তাদের উত্তরণে বেসরকারী সংগঠনের সমান্তরালে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা, পদক্ষেপ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। পরবর্তী দুটি বার্ষিক পরিকল্পনায় (দ্বিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক) নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) নারী উন্নয়নকে সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয় (জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) এবং পরবর্তী ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা, ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নের মূল বিন্দুতে নারী সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সম্পৃক্ত করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব নারী সম্মেলনগুলোর সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় অনুস্বাক্ষর ও সেগুলোর বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। ১৯৯৭ এর মার্চে সরকার প্রথম বারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে যা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত রূপরেখা প্রদান করছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কাউন্সিল (NCWD) গঠিত হয়েছে। এছাড়া চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গিএফ এ অনুমোদন করেছে এবং ফলোআপ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করে এবং ১৯৭৪ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, যা স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন নির্যাতিতা ও ক্ষতিগ্রস্ত নারী সমাজের পুনর্বাসন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৪ সালে একটি কমিটির (এনাম কমিটি) সুপারিশক্রমে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, জাতীয় মহিলা সংস্থার একটি অঙ্গ এবং মহিলা বিষয়ক কোষকে একীভূত করে সৃষ্টি করা হয় মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর। সময়ের অগ্রসরতার সাথে সাথে মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত হয় নতুন নতুন মাত্রা এবং এতে আসে গতিময়তা। এই সকল কর্মসূচিকে আরো সুসংগঠিত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষে ১৯৯০ সনে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে উন্নীত করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয় এবং দেশের ২২টি বৃহত্তর জেলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তখন থেকেই সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহিলা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মবিঅ) এর দায়িত্ব ও কার্যক্রম

মবিঅ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি কল্পে নিম্নোক্ত কার্যক্রম ও দায়িত্ব সম্পন্ন করছেঃ

- ক) নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- খ) নারীর পেশাগত দক্ষতার মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান লাভের সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দান।
- গ) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান।
- ঘ) বেসরকারী মহিলা সংগঠনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও গ্রাম পর্যায়ে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণ।
- ঙ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ।

চ) মহিলাদের চাকরীর সুযোগ। সর্বোপরি মহিলাদের সার্বিক স্বার্থ রক্ষার্থে মহিলা উন্নয়ন বিষয়ে প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল দায়িত্ব।

দেশের প্রত্যন্ত এলাকা জুড়ে সর্বজনীন মহিলা সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলছে ৬৪ জেলায় ও ২৩৬টি থানায় যার জনশক্তি ১৩৩৫ জন (মবিঅ এর বার্ষিক ডায়েরী, ১৯৯৯)। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম প্রধানঃ দুইভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। যথাঃ

(ক) রাজস্ব বাজেটভুক্ত কার্যক্রমঃ শুধুমাত্র সরকারী অর্থায়ন, লোকবল ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে সেগুলি রাজস্ব বাজেটভুক্ত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

(খ) উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমঃ বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থা ও সরকারের যৌথ সহযোগিতায় যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে সেগুলি উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

চারটি অবকাঠামো শাখার মাধ্যমে এই অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের জন্যে প্রকল্পের নিয়োগপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা পচালিত হয়ে থাকে। সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। বর্তমানে বিভিন্ন সাহায্যদাতা সংস্থার সহযোগিতায় সর্বমোট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ১২টি চলতি ও ৯টি নতুন।

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিপ্তর, কুষ্টিয়া, মহিলাদের কল্যাণার্থে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে তার মধ্যে 'বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টি ভিত্তিক কর্মসূচি' প্রকল্প এবং 'মহিলা উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল তথ্যাদি সমৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প দুটি অন্যতম। তম্মধ্যে একটি প্রকল্পের উপর গবেষণামূলক অনুশীলন করা হয়েছে।

চিত্র ১। কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের কাঠামো

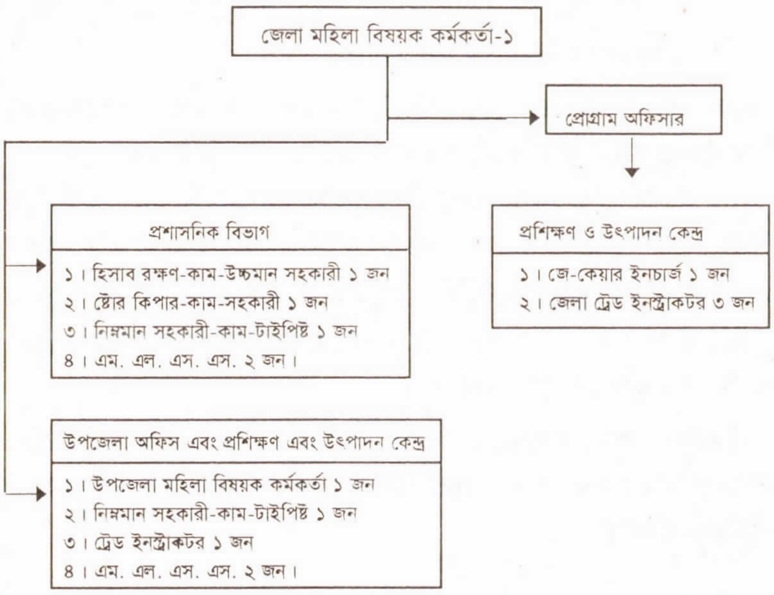

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেটের আওতায় যে কার্যক্রম পরিচালনা করে তা হলোঃ অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এখানে প্রতিবছর ৫০জন ছাত্রীকে (গ্রামীণ দুঃস্থ অসহায় মহিলা এবং বেকার যুবতী) প্রশিক্ষণ কার্যে ভর্তি করা হয়। প্রতি বছর ১ জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০জুন পর্যন্ত প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল। ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বর্তমানে দর্জি বিজ্ঞান, ব্লক বাটিক ও নকশী কাঁথা তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সপ্তাহে ৫দিন (ছুটির দিন ব্যতীত) প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীনীকে রাজস্ব বাজেট থেকে মাসিক ৯০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

এছাড়া বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) ভিজিডি (ভালনারএবল গ্রুপ ডেভেলমমেন্ট- দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন) এর আওতায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে মাসিক ৩০ কেজি হারে বিনামূল্যে খাদ্য (গম, চাউল) বিতরণ করে। দেশের

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে জোরদারকরণ ও দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীরা যদি নিয়মিত না আসে তাহলে যে ক'দিন আসবে না সে ক'দিনের খাদ্য শাস্তিস্বরূপ কম দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অধিদপ্তর তা করে না। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এদের মধ্যে যে সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ কাজে সর্বোচ্চ দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে সরকার কর্তৃক গঠিত 'দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন ও কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল' থেকে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার (৫০০০-১০০০০) টাকা পর্যন্ত সরল সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতাকে ২ বছরের মধ্যে ১২-১৮ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। গ্রাম পর্যায়ে দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই এ তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ কার্যে উৎপাদিত সামগ্রী অধিদপ্তরের স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা হয়। ৫% হারে মুনাফা ধরা হয় এবং তা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিক্রয় কেন্দ্রে তথা সরকারের ঘরে জমা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তা হলোঃ

- ক) বেসরকারী সংগঠন সমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্প।
- খ) মহিলা উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল তথ্যাদি সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প।
- গ) গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও অব্যাহত উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি প্রকল্প।
- ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টোরাল প্রকল্প।

গবেষণায় নির্বাচিত উন্নয়ন প্রকল্প এবং নারী উন্নয়ন

মহিলা অধিদপ্তর সারা দেশে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নিবন্ধীকৃত ১৩

শতের অধিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। মবিঅ কর্তৃক কুষ্টিয়ায় বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মধ্যে 'বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচী' প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের (কেন্দ্র ও জেলা অধিদপ্তর) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ১৯৯৩ হতে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মেয়াদকাল বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর, ২০০০ করা হয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধীকৃত ২০০টি সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা (৪৮টি) ও থানার (১৩৬টি) ৬০,০০০ দরিদ্র মহিলাকে ১৬ শতাংশ হারে সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মহিলাদের অংশগ্রহণের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং জাতির সার্বিক উন্নয়নে মহিলাদেরকে যথাযথভাবে সম্পৃক্তকরণ নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সমষ্টিভিত্তিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই নারী সমাজ অধিকতর সৃজনশীল ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী মহিলা সংগঠনসমূহের কার্যাবলীকে আরও জোরদারকরণ এবং সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও সমৃদ্ধকরণ এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৬২.১৪ লক্ষ (টাকা) যার ১০৭.৩৪ লক্ষ বাংলাদেশ সরকার এবং অবশিষ্ট ৫৫.৮০ লক্ষ দাতা সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে রয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডাব্লিউএফপি)।

প্রকল্প পরিচালনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং

নির্বাচিত বেসরকারী সংগঠনসমূহ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বশীল থাকে। তত্ত্বাবধান/তদারকীর জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রতি মাসে দুইবার প্রকল্পভুক্ত সংগঠন পরিদর্শন করেন। প্রকল্পভুক্ত সকল সংগঠন সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা কর্মকর্তার নিকট ঋণ তহবিলের

ব্যবহারসহ সংগঠনের অন্যান্য কার্যক্রমের উপর মাসিক রিপোর্ট পেশ করে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিজ উপজেলা/জেলার সমন্বিত মাসিক রিপোর্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করার পূর্বে মাঠ কর্মকর্তা জেলা পর্যায়ের প্রতিবেদন পুনর্বিন্যাস ও সমন্বয় করেন। দাতা সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক দাতা সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বিনিয়োগ ব্যয়ের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ, তদারকী এবং মূল্যায়ন শেষে অধিদপ্তরে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত ৫টি বেসরকারী সংগঠনকে নির্বাচন করেছে। নির্বাচিত সংগঠনগুলো কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলা/থানায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। নির্বাচিত সংগঠনগুলো হলোঃ

১। বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া সদর।

২। আশা যুব মহিলা সমিতি, হাউজিং এস্টেট, কুষ্টিয়া সদর।

৩। ঘরণী মহিলা কল্যাণ সমিতি, যদুবয়রা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

৪। শাপলা দুঃস্থ নারী উন্নয়ন কেন্দ্র, হোগলা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

৫। আদর্শ মহিলা কল্যাণ সমিতি, নওপাড়া, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থার আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পটি কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার ৯টি ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামে, গ্রাম পর্যায়ের ক্ষুদ্র সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে ঋণ বিস্তারের টার্গেট রয়েছে ১৯টি ইউনিয়নের ১৪০টি গ্রামে। প্রথম ঋণ বিতরণের তারিখ ০৫/০৬/১৯৯৫ইং থেকে ৩১/১২/১৯৯৯ইং পর্যন্ত। ঘূর্ণায়মান ঋণের মাধ্যমে ২৫৯ জন সদস্যকে ঋণ বিতরণ করেছে (মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন)। এ সকল সমিতির প্রতিটির সদস্য সংখ্যা ২৫ জন।

অধিদপ্তর কর্তৃক সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমিতিকে অতিরিক্ত কোন বাজেট প্রদান করে না। তবে সমিতির উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য বাৎসরিক একটা অনুদান প্রদান করে। অনুদানের পরিমাণে বছর ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সমিতির কয়েক বছরের প্রাপ্ত অনুদান প্রদত্ত হলো (সারণী ১)ঃ

সারণী ১। সমিতিসমূহকে প্রদত্ত অনুদান, ১৯৯৫-৯৯

সাল		প্রদত্ত টাকা
১৯৯৫		৭,০০০/-
১৯৯৬		দেয়া হয়নি
১৯৯৭		৫,০০০/-
১৯৯৮	(৬,০০০/-+৫,০০০/-)	১১,০০০/-
১৯৯৯		১০,০০০/-

উৎস ঃ সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন

এছাড়া ষ্টেশনারী ক্রয় বাবদ জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সমিতিকে প্রতি মাসে ১৫০/- টাকা প্রদান করে থাকে। অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রশিক্ষণের জন্য কাপড়, সুতা, আলমারী, ফাইল, চেয়ার, টেবিল, অফিস ষ্টেশনারী ক্রয় ইত্যাদি বাবদ খরচ করে থাকে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

গবেষণায় প্রকল্পভুক্ত ৪৮জন মহিলার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতাদের সবাই ছিলেন বয়োপ্রাপ্ত মহিলা। ২৬-৩৫ বছর বয়সের উত্তরদাতা মহিলার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী (৩৩.৩৩%) এবং ৩৬-৪৫ বছর বয়সের মহিলার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম (১৬.৬৭%)। বৈবাহিক অবস্থা হলো অপর

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উত্তরদাতা মহিলারা কেউই অবিবাহিত ছিল না। বিবাহিত মহিলার সংখ্যাই ছিল অধিক ৪৩জন (৮৮.৫৮%)। অপরদিকে বিধবা মহিলা ৩জন (৬.২৫%) এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ২জন (৪.১৭%)। শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে এমন মহিলার সংখ্যাই অধিক ২৩জন (৪৭.৯২%), স্কুলে যায়নি এমন মহিলার সংখ্যা ২০জন (৪১.৬৭%) এবং মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা ৫জন (১০.৪২%)।

পেশা ও দক্ষতা

প্রকল্পভুক্ত এলাকার মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত। এদের মধ্যে গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত মহিলাই বেশী (৬০.৪২%)। কৃষিকাজ করে এমন মহিলা (১০.৪২%), ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত মহিলা (২২.৯২%) এবং গৃহস্থালীর ঝিয়ের কাজে নিয়োজিত মহিলা (৬.২৫%)। উত্তরদাতা মহিলাদের বিভিন্ন বিশেষায়িত কাজের দক্ষতা রয়েছে। এর মধ্যে নকশী কাঁথা তৈরী এবং বিড়ি তৈরীর কাজেই অধিক সংখ্যক (১৬.৬৭%) দক্ষ। কোন কাজে দক্ষতা নেই তাদের সংখ্যা ১৬ জন (৩৩.৩৩%)।

খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

গ্রামীণ মহিলাদের নিম্ন আয়ের কারণে তারা শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালরির যোগান দিতে পারে না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। ৪৮ জনের মধ্যে মাত্র ৬জন (১২.৫০%) মহিলা সে চাহিদা মেটাতে সক্ষম। খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে ৩৭.৫০% মহিলা। এদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ মাত্র (১০০০-১২০০)।

প্রকল্প প্রদত্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ

গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা কেন প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করছে এবং ঐ ঋণ গ্রহণের বাস্তব ফলাফল তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব কতটুকু এই অংশে তার

বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বস্তুত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র বিমোচনের প্রক্রিয়ার সফলতা কতটুকু সে সম্পর্কে সুবিধাভোগী গোষ্ঠির মনোভাব জরীপ করে তার উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ঋণ গ্রহণের কারণ

ঋণ গ্রহণ এবং অর্থ উপার্জনকারী কাজ করতে অগ্রাহী হবার পেছনে কারণ হিসেবে ৮৭.৫% উত্তরদাতা পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার বিষয় উল্লেখ করে। এসব মহিলাদের শতকরা ৫৬জনের ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান। এদের সকলেই বিবাহিতা কিন্তু পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের স্বামীদের আয় উপার্জন ছিল খুবই সামান্য। এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের একজনের মন্তব্য হচ্ছে ''বর্তমানে সব জিনিসেরই দাম বেড়েছে। এক মণ চাল কিনতে কমপক্ষে ৪০০ টাকা এবং একটি শাড়ি কিনতে কমপক্ষে ১২০ টাকা লাগে। কাজেই বর্তমানে মাত্র একজন মানুষের আয়-উপার্জনে বেঁচে থাকা সত্যিই কঠিন। আমাগো দারিদ্র ঘুচছে না সত্য, কিন্তু সমিতি আমাগো ঋণ দিয়ে যথেষ্ট উপকার করছে।'' কিছু কিছু মহিলার স্বামী বা পিতার মৃত্যু, তালাক, বিচ্ছেদ (সন্তান সহ/ব্যতীত) বা স্বামীর অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন সামাজিক নিরাপত্তা না থাকায় স্বামী বা পিতার মৃত্যুতে অর্থাৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে এসব দরিদ্র মহিলা ও ছোট বাচ্চাদের চরম অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। এহেন অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে মুক্তি প্রাপ্তির আশায় এসব মহিলা সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং আয়-উপার্জনকারী কাজে নিযুক্ত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক কষ্ট লাঘবের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাসিক আয় ঋণ প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ মহিলার (৮৫.৪২%) পরিবারের মাসিক আয় ছিল ২০০০-৩০০০/- এবং মাত্র ৪.১৭% উত্তরদাতা মহিলার মাসিক আয় ছিল ৩০০১-৪০০০/-টাকা। এর উর্ধ্বে কোন মাসিক আয় গোষ্ঠী ছিল না। প্রকল্পভুক্ত হবার পর অর্থাৎ বর্তমানে ৩৯.৫৮% মহিলার মাসিক আয় ২০০০-৩০০০/-, ৩০০১-৪০০০/- পর্যন্ত মাসিক আয় উপার্জনকারীর শতকরা হার হচ্ছে

১২.৫০% যেখানে পূর্বে এই হার ছিল মাত্র ৪.১৭%। ৮.৩৩% মহিলা বর্তমানে ৪০০০-৫০০০/- আয় করছে। পূর্বে এই আয় গ্রুপে কোন মহিলাই পাওয়া যায়নি। সুতরাং বলা যায় ঋণ প্রকল্প মহিলাদের মাসিক আয়ের একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সারণী ২ । মাসিক আয়ে ঋণ প্রকল্পের প্রভাব

মাসিক আয়	পূর্বের		বর্তমানের	
	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১০০০	২	৪.১৭	৩	৬.২৫
১০০১-২০০০	৩	৬.২৫	১৬	৩৩.৩৩
২০০১-৩০০০	৪১	৮৫.৪২	১৯	৩৯.৫৮
৩০০১-৪০০০	২	৪.১৭	৬	১২.৫০
৪০০১-৫০০০	–	–	৪	৮.৩৩

প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার

ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ৮.৩৩% কৃষি জমির সার ক্রয়, ৬.২৫% জমি কট/দাদন রাখা, ২২.৯১% ক্ষুদ্র ব্যবসা/মুদী দোকানের মালামাল ক্রয়, ১২.৫% সেলাই মেশিন ক্রয়, ৬.২৫% গরু-ছাগল ক্রয়, ৮.৩৩% ঘর নির্মাণ বাবদ খরচ, ৪.১৭% মেয়ের বিয়ে বাবদ খরচ, ৪.১৭% ধান ভানা (ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা), ৪.১৭% টিউবওয়েল ক্রয় বাবদ এবং ৪.১৭% বাড়িতে লেট্রিন স্থাপন বাবদ খরচ করেছে বলে জানায়।

সারণী ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মহিলা (৭৯.১৬%) ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করেছে এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টা করছে। ২০.৮৪% মহিলা তাদের প্রাপ্ত ঋণ অনুৎপাদনশীল খাত, যেমন- ঘর নির্মাণ, মেয়ের বিয়েতে খরচ/যৌতুক প্রদান,

বাড়িতে টিউবওয়েল ও লেট্রিন স্থাপন বাবদ খরচ করেছে। উল্লেখ্য যে, যে ৪জন (৮.৩৩%) মহিলা ঋণের অর্থ দিয়ে ঘর নির্মাণ করেছে, তাদের মধ্যে আবার ২জন (৪.১৭%) মহিলা ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দিয়েছে। এরা কুষ্টিয়া শহরের উপকণ্ঠে বসবাস করে বিধায় নির্মাণকৃত ঘর ভাড়া দিয়ে আয় উপার্জনের একটি সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে। কিছু সংখ্যক মহিলা অনুৎপানদশীল খাতে

সারণী ৩ । প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার

ঋণের ব্যবহার	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
কৃষি জমির সার ক্রয়	৪	৮.৩৩
※ জমি কট/দাদন	৩	৬.২৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১১	২২.৯১
সেলাই মেশিন ক্রয়	৬	১২.৫
গরু-ছাগল ক্রয়	৩	৬.২৫
ঘর নির্মাণ	৪	৮.৩৩
শাক সব্জীর চাষ	২	৪.১৭
রিকসা/ভ্যান ক্রয়	৭	১৪.৫৮
মেয়ের বিয়ে বাবদ	২	৪.১৭
※※ ধান ভানা	২	৪.১৭
টিউবওয়েল ক্রয়	২	৪.১৭
লেট্রিন স্থাপন	২	৪.১৭
মোট	৪৮	১০০

※ জমি কট/দাদন রাখা বলতে বুঝায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে অন্যের জমিতে উৎপন্ন ফসল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করার অধিকার অর্জন করা।

※※ ধান ভানা- বাজার থেকে ধান ক্রয় এবং চাল তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করা।

প্রাপ্ত ঋণ খরচ করলেও একথা সত্য যে তাদের মধ্যে (৮.৩৩%) এর স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকেই তারা বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। উপরন্তু যৌতুক নামক যে সামাজিক ব্যাধি গ্রামীণ মহিলাদের উপর চেপে বসেছে তাতে ৪.১৭% মহিলার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদান বাবদ প্রাপ্ত ঋণ খরচ করার প্রবণতা খুবই সামান্য বলে এ অনুসন্ধানে পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের ভাষ্যমতে প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে তাদের কেউ কেউ স্বামী/ছেলের জন্য ভ্যান বা রিক্সা ক্রয় করে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্বল্প পুঁজি সরবরাহ করে, সেলাই মেশিন ক্রয় করে ছোট খাট অর্ডার নিয়ে এবং নানাভাবে মাসে কিছুটা বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এতে করে দারিদ্র্য না ঘুচলেও মৌলিক চাহিদা পূরণের ন্যূনতম সংস্থান হয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সন্তানদের শিক্ষা ও ঋণ প্রকল্পের প্রভাব

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করেন কিনা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো উচিৎ কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৮১.২৫% মহিলার হ্যাঁ সূচক জবাব দেন, ১২.৫০% মহিলা না সূচক জবাব দেন। তারা বলেন ছেলেমেয়েদের বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাছাড়া ছেলেরা বাড়তি কিছু উপার্জন করে সংসারের প্রয়োজন মিটায়। ৬.২৫% মহিলা কোন মন্তব্য করেননি। ঋণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর উত্তর দাতা মহিলাদের মধ্যে ৬০.২৪% এর সন্তানরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং অধ্যয়ন করছে। পূর্বে এর হার ছিল ৫৬.২৫%।

ঋণ প্রাপ্তই আয় বৃদ্ধির কারণ

প্রকল্প থেকে ঋণ পাওয়ার কারণেই সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কি না প্রসঙ্গে ৭৭.০৮% উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক, ১৪.৫৮% না সূচক জবাব দেয় এবং ৮.৩৩% মহিলা কোন মন্তব্য করেনি। প্রকল্প ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে সকল উত্তরদাতা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন। ৮জন (১৬.৬৭%) অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক পদমর্যাদার অন্য কোন স্তরে উন্নীত হতে না পারলেও দৈনন্দিন আয়ে একটি স্বল্প মাত্রার বাড়তি সংযোজন পূর্বের তুলনায় পরিবারে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা

আনয়ন তাদের এই ইতিবাচক মনোভাবের পেছনে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে। ঋণ প্রাপ্তির অর্থ ক্ষুদ্র পরিসরে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার ফলে অনেকের বর্তমান আয় আগের তুলনায় বেড়েছে, সন্তানরা স্কুলে যাচ্ছে, খাবারে মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে ১২জন (২৫%) এর পরিবারের সদস্যগণ সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন হলেও মাছ/গোস্ত এর মত আমিষ খেয়ে থাকেন বলে জানান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রাক্কালে এদের কথা বলার ধরন, বাচনভঙ্গি, শারিরীক অবস্থা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে অবস্থার ন্যূনতম উন্নতি যে হয়েছে তা বলা যায়।

সারণী ৪ । উৎপাদনশীল কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	১৬	৩৩.৩৩
অপ্রশিক্ষিত	৩২	৬৬.৬৭

দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের ঋণদান কর্মসূচির পাশাপাশি ঋণের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সংগঠন বিভিন্ন হস্তকর্মে প্রকল্পভুক্তদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উত্তরদাতাদের মধ্যে অপ্রশিক্ষিত সদস্যার সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য হারে কম (৬৬.৬৭%)। পক্ষান্তরে মাত্র এক তৃতীয়াংশ উত্তরদাতার প্রশিক্ষণ রয়েছে । সারণী ৪ থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রকল্পভুক্ত মহিলারা প্রাপ্ত ঋণ কী কাজে বিনিয়োগ করবে সে বিষয়ে অধিকাংশ (৬৬.৭) মহিলাই প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। ফলে তারা উৎপাদনশীল খাতে অর্থ বিনিয়োগ করলেও অদক্ষতার কারণে প্রত্যাশিত অর্থ উপার্জন করতে পারছে না। একথা সত্য যে, সদস্যদের যখন ঋণ প্রদান করা হয় তখনই শুধু কী কাজে তারা ঋণ গ্রহণ করেছে তা দেখা হয়। ঋণ প্রাপ্তির পর সদস্যরা তা উক্ত কাজে বিনিয়োগ করল কি না পরবর্তীতে তা জোরালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় না। কারণ সমিতির সংশ্লিষ্টতা মূলতঃ ঋণের কিস্তি সময়মত সংগ্রহ করা; সদস্যরা প্রশিক্ষিত হলো কি না কিংবা বিনিয়োগকৃত ঋণের লভ্যাংশ থেকে তারা

ঋণ পরিশোধ করছে কি না সেটি তাদের নিকট বিবেচ্য বিষয় নয়। এ কারণেই প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব হ্রাস পায়। ফলে প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

উপার্জিত আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ

জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঋণ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৮৫%) উপার্জিত অর্থ গৃহস্থালীর দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষতঃ খাবার ও পোশাক বাবদ ব্যয় করে এবং অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক (৫%) তাদের আয়ের সিংহভাগ সন্তান সন্ততির লেখাপড়া বাবদ ব্যয় করে থাকে বলে জানায়। মহিলাদের উপার্জিত অর্থ নিয়ন্ত্রণে তাদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর না হলেও অন্ততঃ গ্রামীণ পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি ততটা প্রতিফলিতহয়নি। সারণী ৫-এ দেখা যায় যে, শতকরা ৫৬.২২% মহিলার তাদের উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং শতকরা ৩৩.৩৩% এর আয় তাদের স্বামীরা নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছে যে, তাদের আয় কম ও অনিয়মিত হওয়ায় তাদের অভিভাবকরা তাদরে উপার্জিত অর্থ ইচ্ছামত খরচের অনুমতি দিয়েছেন। শতকরা ১০.৪২% মহিলার উপার্জনের উপর তাদের পিতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে জানায়। অধিকাংশ মহিলাই যারা নিজেদের উপার্জন নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাদের অভিভাবকও রয়েছে তারা জানায় যে, কিভাবে তাদের উপার্জিত অর্থ খরচ কবা হবে সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নিয়ে থাকে।

সারণী ৫ । উত্তরদাতাদের উপার্জিত আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণকারী	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নিজে	২৭	৫৬.২৫
স্বামী	১৬	৩৩.৩৩
পিতা	৫	১০.৪২
মোট	৪৮	১০০.০

এই দৃশ্যমান স্বাধীনতার পেছনে দুটো কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ অভিভাবকরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মহিলারা তাদের উপার্জিত অর্থের সর্বাংশ বা বেশীরভাগই গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষণের পেছনেই ব্যয় করবে, নিজের জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ কোন বিবাহিত মহিলাই তাদের নিজ পিতা-মাতার পরিবারের জন্য ব্যয় করছে না। যদি মহিলারা নিজেদের জন্য বা নিজ মা-বাবার পরিবারের জন্য খরচ করতো, তবে ঘটনা অন্যরকম হতে পারতো। একজন পুরুষ অভিভাবক ঘটনাকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করে, 'আমার স্ত্রী খুব বেশী রোজগার করে না। কাজেই আমি তাকে তা তার কাছেই রাখতে দেই। তবে সে তা পরিবারের জন্যই খরচ করে থাকে।'

সারণী ৬। সামাজিক মর্যাদার উপর আয়-উপার্জনের প্রভাব

সামাজিক মর্যাদা	পরিবারে	শতকরা (%)	পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে	শতকরা (%)
পরিবর্তন হয় নাই	৩৫	৭২.৯২	৩৯	৮১.২৫
বেড়েছে	১২	২৫.০০	৬	১২.৫০
কমেছে	১	২.০৮	৩	৬.২৫
মোট	৪৮	১০০	৪৮	১০০

সামাজিক মর্যাদা ও আয় উপার্জন

পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে মহিলাদের আয়-উপার্জন কোন ভূমিকা রাখে কি না, তা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এই সমীক্ষায় চালানো হয়। ব্যক্তি হিসেবে মহিলাদের বাকস্বাধীনতা, যাতায়াতের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সামাজিক মর্যাদার সূচক হিসেবে মূল্যায়নের জন্য যাচাই করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রত্যাশার বিপরীত বিষয়ই দেখা যায়। অধিকাংশ মহিলাই জানায় যে, তাদের উপার্জন তাদের পরিবারে (৭২.৯২%) বা প্রতিবেশীদের (৮১.২৫%) মধ্যে তাদের সামাজিক অবস্থানের বা মর্যাদার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেনি। উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেন, 'আয় উপার্জনকারী বলে

আমি বিশেষ বা আলাদা ব্যবহার পাই না। আমার স্বামীই সব কিছুর মালিক, আমার মতামতের কোন মূল্য নেই।' কেউ কেউ জানায় যে, যদিও তারা তাদের পরিবারের সদস্যাদের কাছ থেকে বা পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিশেষ কোন ব্যবহার বা মর্যাদা লাভ করে না, তবুও তারা তাদের উপার্জন দিয়ে যে সাহায্য তাদের অভিভাবকদের করতে পারছে, তা তাদের মধ্যে নিজেদেরকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবার মত একটা অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

যখন তারা তাদের উপার্জন দিয়ে তাদের পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় এবং বাচ্চাদের ছোট খাটো বায়না মেটাতে পারে তখন তারা আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে বলে জানায়। কিছু কিছু মহিলা জানায় যে, পরিবারে (২৫%) ও পাড়া প্রতিবেশীদের (১২.৫%) মধ্যে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব মহিলাদের উপার্জন গৃহস্থালীতে একটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করেছে। তাছাড়া এদের কারো কারো ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে। এ কারণেই হয়তো তাদের সামাজিক মর্যাদায় অনুকূল পরিবর্তন এসেছে।

পেশাগত সন্তুষ্টি

ধান সিদ্ধ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দর্জির কাজ বা কৃষি কাজের মত মহিলাদের একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৬০.৪২%) পেশাগত সন্তুষ্টির ব্যাপারে ইতিবাচক জবাব দিলেও তার মাধ্যমে উদ্দ্যামপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। এর কারণ হিসেবে তাদের মতামত হলোঃ "একেতো আমরা গরীব, অন্যদিকে অশিক্ষিত, কাজেই সন্তুষ্টি না হয়ে উপায় কি? তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির আগে এর চেয়েও কষ্টকর জীবন যাপন করতাম এবং বর্তমানে আয় সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।" অবশিষ্ট মহিলারা (৩৯.৫৮%) তাদের কাজের উপর সন্তুষ্ট নয়। তার প্রধান কারণ হলো, ঐ কাজে তাদের আয়ের পরিমাণ খুবই কম। এসব মহিলাদের অধিকাংশই কোন না কোন বিশেষায়িত হস্তকর্মে নিয়োজিত। যেমনঃ- নকশী কাঁথা তৈরী, পাটের হস্তশিল্প বা কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী ইত্যাদি। আর তিনজন মহিলা যারা তাদের নিজ গ্রামের ভিতর ও বাহিরে গৃহ পরিচারিকার কাজে নিয়োজিত তারাও আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে এই কাজের নিম্ন মর্যাদার কারণে সন্তুষ্ট নয়।

সারণী ৭ । উত্তরদাতাদের পেশাগত সন্তুষ্টি

সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	অসন্তুষ্টির কারণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
২৯	১৯	স্বল্প আয়	১২	২৫.০০
(৬০.৪২%)	(৩৯.৫৮%)			
		অনুপযোগী পেশা	৩	৬.২৫
		নিম্ন মর্যাদা	৩	৬.২৫
		অন্যান্য	১	২.০৮
		মোট	১৯	১০০

প্রাপ্ত ঋণের বিবরণ

উল্লেখ্য যে, সমিতির সকল সদস্যকেই ৩০০০/- করে ঋণ প্রদানের কথা প্রকল্প দলিলে উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সমিতি এ নিয়ম লংঘন করেছে (সারণী-৮)। অবশ্য যে সব সদস্য (৮.৩৩%) ৪০০০/- বা ৫০০০/- ঋণ পেয়েছেন তারা জানান যে, প্রথম পর্যায়ে তারা সকলেই ৩০০০/- ঋণ পেয়েছিলেন। প্রথম পর্যায়ের ঋণের টাকা পরিশোধের পর যে সকল সদস্য অধিক ঋণ নিতে আগ্রহী হয়েছিল তাদের কার্যক্রম বিবেচনা করে সমিতি বেশী পরিমাণ ঋণ প্রদান করেছে। তবে, ২০০০/- ঋণ প্রাপ্ত ৪৩.৭৫% মহিলা প্রথম পর্যায়েই উক্ত পরিমাণ টাকা ঋণ পেয়েছেন বলে জানান। সদস্যদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রেও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। সাধারণত ৩০০/- টাকার ঋণের বিপরীতে প্রতি সপ্তাহে ৬৭/- টাকা হিসাবে ৫২ কিস্তিতে ঋণ আদায় করার কথা। এক্ষেত্রে নিয়ম ঠিক থাকলেও ২০০০/- টাকার বিপরীতে ৫০/- হিসেবে ৫২ কিস্তিতে এবং ৪০০০/- টাকার বিপরীতে১০০/- হিসেবে ৫২ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয় বলে সদস্যরা জানায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম বা বেশীর পরিপ্রেক্ষিতে সমিতি ইচ্ছা অনুযায়ী কিস্তি আদায় করে থাকে। লক্ষ্যণীয় যে, ঋণের কিস্তি ছাড়াও সমিতি সকল (১০০)

সদস্যার কাছ থেকে সপ্তাহে ১০/- টাকা সঞ্চয় বাবদ গ্রহণ করে থাকে এবং সঞ্চয় বহিতে তা লিপিবদ্ধ থাকে। ৫ বছর পর ৫% হারে সুদসহ আসল ফেরত দেয়া হবে। যে কোন সদস্য ৫ বছরের পূর্বেই সঞ্চয়কৃত টাকা উত্তোলন করতে পারবে, তবে সেক্ষেত্রে সুদ ছাড়া শুধু আসল টাকাটাই দেয়া হবে বলে উত্তরদাতারা জানায়।

সারণী ৮ । উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত ঋণের বিবরণ

ঋণের পরিমাণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
২০০০	২১	৪৩.৭৫
৩০০০	২৩	৪৭.৯২
৪০০০	৩	৬.২৫
৫০০০	১	২.০৮

উত্তরদাতাগণ ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা এর জবাবে ৭২.৯২% না সূচক, ১৮.৭৫% হ্যাঁ সূচক, ৮.৩৩৫ মহিলা কোন মন্তব্য করেননি। ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয় বলে যে সকল মহিলা মত প্রকাশ করেন তাদের যুক্তি হলো ২০০০-৩০০০/- দিয়ে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে লাভজনক অর্থনৈতিক কাজে বিনিয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নয়। টাকার পরিমাণ আরো অধিক (অন্ততপক্ষে ৫-১০ হাজার টাকা) হলে যে সমস্ত পেশায় তারা নিয়োজিত রয়েছে তা ভালভাবে পরিচালনা করে অধিক উপার্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

যে সমস্ত মহিলারা (১৮.৭৫%) ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত বলে মনে করেন তারা বলেন, বেশী পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে প্রত্যাশা অনুযায়ী লাভ না হলে

ঋণের কিস্তি দেয়া সম্ভব নয়। যেহেতু তারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করার মত অন্য কোন সম্পদ বা আয়ের উৎস নেই তাই বর্তমানে দেয় পরিমাণকেই পর্যাপ্ত বলে মনে করে। তাদের যুক্তি হলো, ''কম পরিমাণ ঋণ নিব, আস্তে আস্তে পরিশোধ করার পর দরকার হলে পুনরায় নিব।'' দুবেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে এটাই তাদের কাছ বড় বলে মনে হয়। এটা ছাড়া জীবনে আরো যে কিছু চাওয়া পাওয়ার আছে সেটা তারা ভুলেই গেছে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের আবর্তে পড়ে। দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে আনার জন্য সরকারেরও তেমন সূদুর প্রসারী উদ্যোগ নেই, যারা দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত তাদেরও প্রচেষ্টার কমতি রয়েছে। ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত কি না সে বিষয়ে ৮.৩৩% মহিলা কোন মন্তব্য করেনি।

জীবন যাত্রার মান

উত্তরদাতা মহিলাদের জমির মলিকানা, বাসগৃহের অবস্থা, খাবার পানির উৎস, লেট্রিন সুবিধা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনযাত্রার মানের অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। সারণী ৯-এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৪৭.৯২%) মহিলা ১ বিঘার কম পরিমাণ জমির মালিক। অপরদিকে ৩-৪ বিঘা পরিমাণ জমি রয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা সবচেয়ে কম (২.০৮%)। মহিলাদের অধিকাংশের (৭৭.০৮%) বাড়িতে কাঁচা ঘর। মাত্র ৮.৩৩% মহিলার বাড়িতে পাকা ঘর আছে এবং ১৪.৫৮% মহিলা আধাপাকা বাড়িতে বসবাস করে। অধিক সংখ্যক (৫০.০০% ও ৪.১৬%) মহিলারা জানায় তাদের খাবার পানির উৎস হলো টিউবওয়েল। উত্তরদাতা মহিলাদের ৪৭.৯২% ল্যাট্রিন সুবিধা ভোগ করে এবং ১৬.৬৬% মহিলা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি। জীবনযাত্রার মানের বর্তমান অবস্থা দারিদ্র মুক্ত স্বচ্ছল জীবন কাঠামোর ইংগিত বহন করে না। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৬৬.৬৭%) ভূমিহীন বা ১ বিঘার কম জমির মালিক। প্রকল্প ঋণ তাদের জীবনধারণ কাঠামোয় তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না।

সারণী ৯। উত্তরদাতাদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান

জীবনযাত্রার মান		উত্তরদাতা	
		গণসংখ্যা	শতকরা (%)
জমির মালিকানা	ভূমিহীন	৯	১৮.৭৫
	১ বিঘার কম	২৩	৪৭.৯২
	১-২ বিঘা	১২	২৫.০০
	২-৩ বিঘা	৩	৬.২৫
	৩-৪ বিঘা	১	২.০৮
বাসগৃহ	কাঁচা	৩৭	৭৭.০৮
	আধাপাকা	৭	১৪.৫৮
	পাকা	৪	৮.৩৩
খাবার পানির উৎস	কুয়া	২২	৪৫.৮৩
	টিউবওয়েল (সাধারণ)	২৫	৫০.০০
	টিউবওয়েল (একক)	২	৪.১৬
লেট্রিন	না	১৭	৩৫.৪২
	হ্যাঁ	২৩	৪৭.৯২
	মন্তব্য নেই	৮	১৬.৬৬

সমস্যা ও সুপারিশ

প্রকল্প এলাকা, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংগঠন ও সমিতিসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে কতিপয় সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্যাদির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছেঃ

১) অপর্যাপ্ত ঋণ প্রাপ্তি প্রকল্পভুক্তদের জন্য একটি সাধারণ সমস্যা। মবিঅ এর জটিল ঋণ দান প্রক্রিয়া, অনমনীয় প্রশাসন ব্যবস্থা এবং ঋণের জন্য আবেদন পেশ ও ঋণ উত্তোলনের মাঝে সুদীর্ঘ সময় সদস্যদের ঋণ প্রাপ্তিতে অনাবশ্যক সমস্যা সৃষ্টি করে। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, বৃত্তিমূলক বিষয়ে যে সব মহিলারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের অনেকেই ঋণ পাননি। আবার যারা ঋণ পেয়েছেন তাদের অধিকাংশের (৯১.৬৭%)

ঋণের পরিমাণ ২০০০-৩০০০/- (সারণী ৮) যা তাদের ভাষায় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই অপ্রতুলতার কারণে তারা স্বাবলম্বী হতে পারছেন না। অপরদিকে যারা ঋণ পাননি তারা তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন না।

২) সদস্যাদের কাছ থেকে সাপ্তাহিক অতিরিক্ত সঞ্চয় (১০টাকা) নেওয়ার বিধান না থাকলেও সংগঠন তা নিয়ে থাকে। এতে দরিদ্র মহিলাদের চেয়ে সংগঠন উক্ত সঞ্চয় দিয়ে ঋণ কার্যক্রম বিস্তারের মাধ্যনে নিজেরা লাভবান হচ্ছে।

৩) ঋণ কার্যক্রম এবং তার ফলাফল সন্তোষজনক হয় না। কারণঃ

ক) যথাযথ প্রেষণা কার্যক্রমের অভাব;

খ) সমিতির অপ্রতুল এবং সেবা প্রদানে অদক্ষ জনবল;

গ) সমিতির সদস্যরা শিক্ষিত না হওয়ায় প্রাপ্ত ঋণের সদ্ব্যবহারে অক্ষমতা;

ঘ) স্বামীদের স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ;

ঙ) ঋণ অনাদায়ী থাকা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি দরিদ্রতা বিমোচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

৪) নিবন্ধকৃত সমিতিগুলো তাদের মূল কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক যে অর্থ সাহায্য পায় তা নিতান্তই অপ্রতুল, যার ফলে টার্গেট গ্রুপের স্বার্থে সমিতি কাযক্রম বেগবান করতে পারে না।

৫) প্রকল্প কার্যক্রম মনিঅ এর অফিস থেকে বেশ দূরবর্তী এলাকায় বাস্তবায়নাধীন। ফলে প্রতিনিয়ত প্রকল্প কার্যক্রম মনিটর, তত্ত্বাবধান এবং বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কষ্টসাধ্য হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে।

৬) মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে গ্রামে শক্তিশালী মহিলা বিষয়ক সংগঠনের অভাবে প্রকল্প ঋণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক হচ্ছে না।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অন্তর্নিহিত কেন্দ্রপ্রান্ত সামগ্রিক সমস্যাগুলিও প্রকল্প পরিচালনা ও বাস্তবায়নে জটিলতা বৃদ্ধি করছে। যেমনঃ

১) বাংলাদেশে সকল মন্ত্রণালয়ের (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ) উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের ছক বা ডকুমেন্টগুলি কাঠামোবদ্ধ এবং অনমনীয়। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠি এবং তাদের সমস্যাদির ব্যাপারে প্রয়োজনে কোন বিকল্প পছন্দ সম্পর্কে পরামর্শ দেবার সুযোগ প্রকল্প ধারণা উত্থাপনকারীদের থাকে না। এতে করে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক Botton up planning এর ধারণা তাত্ত্বিকভাবে বলা হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগের প্রয়াস নেই। বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৬) এ কারণে প্রকল্পের ছক সংশোধনের সুপারিশ করেছে।

২) প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতার আবর্তে জর্জরিত। ১৯৯৮সালে Center for Development & Research Study (CDRS) এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, ৩৩টি জিওবি প্রকল্প অনুমোদন পেতে সময় লেগেছে ৪০৬দিন (Institutional Review of WID Capability of GOB, vol. 3, 1994)। চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্প প্রস্তাবনাটি অন্তত ৫২ ধাপ অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়। দাতা সংস্থার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনুমোদন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে। ফলে অনেক সময় এমনও হয় যে, প্রকল্পভুক্ত এলাকার টার্গেট গ্রুপের চিহ্নিত সমস্যার তীব্রতা ততদিনে হ্রাস পেতে থাকে।

৩) প্রকল্প চিহ্নিতকরণের মূল সমস্যা হলো প্রকল্প ধারণা গঠন এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট কৌশল ও প্রক্রিয়ার অভাব। ফলে প্রায়শঃ সমস্যার তীব্রতার চেয়ে প্রকল্প চিহ্নিতকরণে সম্পদের প্রাপ্যতা ও দাতাগোষ্ঠির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হয়। ফলশ্রুতিতে টার্গেট গ্রুপের বা জাতীয় সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাহত হচ্ছে।

৪) আই.এম.এ.ডি'র ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক রিপোর্টগুলি কেবলমাত্র প্রকল্পের ভৌত কাঠামোর অগ্রগতির উপর দৃষ্টি দিয়ে প্রণীত হয়; কিন্তু গুণগত ইস্যুগুলোতে যেমন প্রকল্পের সুবিধাদির সুষম বন্টনের উপর আই.এম.এ.ডি সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করে না। ফলে বর্তমান ব্যবস্থায় প্রকল্পের মাধ্যমে টার্গেট গ্রুপের (মহিলাদের) জন্য কী ধরনের বা কী পরিমাণ সুবিধা (benefits) বর্ধিত হারে যুক্ত হচ্ছে অথবা হচ্ছে না তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রকল্পে কার্যকরী এবং

প্রত্যাশিত কর্মসূচির সংযোজন অনুপস্থিত থাকে।

৫) প্রকল্প প্রণয়নের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যেমন তথ্য সংগ্রহ, বেইজ লাইন সার্ভে, চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদি সময়ের অভাবে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের অভাব এবং দাতা গোষ্ঠীর বিলম্বে বরাদ্দ প্রদানসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুষ্প্রাপ্যতা প্রকল্পের ফলপ্রসু বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

৬) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হয়। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ব্যহত হয় এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে বরাদ্দকৃত সমুদয় টাকা সঠিক খাতে ব্যয় না হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি এবং স্থিরকৃত টার্গেট অর্জন ব্যহত হচ্ছে। এ ছাড়া অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হওয়ায় বিগত সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা নতুন সরকার প্রায়শই আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। উপরন্তু বিদেশী দাতাগোষ্ঠী একই কারণে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রায় বন্ধ করে দেয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফলে প্রকল্প কার্যক্রমের গতি মাঝ পথে স্থবির হয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশসমূহ

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্পের পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব করা হলোঃ

- প্রকল্পের সমুদয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধ করা প্রয়োজন।
- শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। তাই প্রকল্প কার্যক্রমে অবশ্যই প্যাকেজ প্রোগ্রাম সন্নিবেশিত থাকবে। সেখানে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনকে উৎসাহিত করার নীতি যুক্ত হবে।
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে ফলপ্রসু কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্নমুখী সমস্যা যেমন নিম্ন পদমর্যাদা, অপর্যাপ্ত লজিষ্টিক সুবিধাদি, গতানুগতিক প্রশিক্ষণ, অযৌক্তিক কর্ম বিশ্লেষণ, অপর্যাপ্ত দিক নির্দেশনার সমাধান প্রয়োজন। জেলা এবং থানা পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের চাকরীর

গ্রেড ও অন্যান্য সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন যাতে অন্যান্য অফিসের অনুরূপ কর্মকর্তাদের সম্মান ও পদমর্যাদা ভোগ করতে পারে।

* প্রকল্পগুলিতে ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট শিল্প কারখানা ও কুটির শিল্প স্থাপন করে গ্রামের মহিলাদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র গৃহ-অভ্যন্তরে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের গতানুগতিক জীবন ধারায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। সেখানে এসব কারখানাগুলো শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রের মতোই মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।
* প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অবকাঠামো মবিঅ-এর প্রযুক্তি বাছাইয়ের কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা প্রয়োজন। প্রচলিত দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রম অপসারণ না ঘটিয়ে উৎপানদশীলতা বৃদ্ধি করে প্রকল্প প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে দরিদ্র মহিলাদের কর্ম-সংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কারণ, আধুনিক শ্রম অপসারণকারী, পুঁজিঘন প্রযুক্তিতে বৃহৎ বিনিয়োগ দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে ফেলে।
* প্রত্যক্ষ কৃষিকর্মে মহিলাদের অশংগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী খাস জমি বিভিন্ন মহিলা গ্রুপের মধ্যে বন্টন করে সময়মত প্রয়োজনীয় ঋণ ও উপকরণ সরবরাহ করার কর্মসূচি রেখে প্রকল্প ডিজাইন করলে কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে।
* প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রপঞ্চ অনুশীলন এবং তৎ সংগে প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুশীলন করে টার্গেট গ্রুপের উপর উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব দক্ষতার সাথে নিরূপণের কৌশল স্থির করা প্রয়োজন।
* জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম ও শহর এলাকায় মহিলাদের বিভিন্নমুখী পেশার উপর জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের জন্য তথ্য সেন্টার বা লাইব্রেরী স্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ, সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংগঠনগুলো দক্ষতার উপর ভিত্তি করে দল গঠন করতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের কর্মকান্ডে মহিলাদের দক্ষতা অনুসারে বিভক্ত করে একেকটি দল গঠন করা যেতে পারে। এতে করে প্রকল্প কার্যক্রমে সদস্যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সমাবেশ (mobilige) করার ক্ষেত্রে শ্রম, সময় ও ব্যয়- সবই সংকুচিত হবে। এজন্য নমনীয় আচরণ বিধি প্রণয়ন করাই অধিক যুক্তিসংগত।
- প্রশিক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্প ঋণের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সদস্যদের প্রকল্প ঋণ যে কাজে দেয়া হয়েছে তা উক্ত কাজে বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ দ্বারা ঋণ পরিশোধে বরাবরই তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে। ফলে মহিলারা উপার্জনমুখী কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।
- প্রকল্পের আওতায় অনাদায়ী ঋণ আদায় করে তা পুনরায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে বিতরণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে মবিঅ-কে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন এবং যে সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা ঋণ সুবিধা না পাবার কারণে লব্ধ দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছে না তাদের ঋণের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- বস্তুত দারিদ্র্য বিমোচন, কিংবা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কিংবা উৎপাদনক্ষম জনসম্পদ হিসেবে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে জিও এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্পগুলি সর্বাংশে তাদের উৎপাদনশীল স্বনির্ভর জনসম্পদে পরিণত করতে বরাবরই ব্যর্থই হচ্ছে। কারণ, বৃটিশ প্রবর্তিত সরল কিংবা ঘূর্ণায়মান সুদে ঋণদান প্রথা আজন্ম একটি শ্রেণীকে ঋণগ্রস্ততার কঠিন বেড়িতে আবদ্ধ রাখছে। অথবা কখনও কখনও সর্বশান্ত অবস্থায় তাদের প্রাক জীবন ধারায় ফিরিয়ে দিচ্ছে। কার্যতঃ ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যগোষ্ঠীকে উপার্জনক্ষম জনসম্পদে পরিণত করার অভিজ্ঞতা দৃষ্টিগোচর হয় না বললেই চলে। সুতরাং জনশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনেই ঋণ প্রকল্পের ধারণা, প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ার পরিবর্তন আবশ্যক।
- সর্বোপরি নারী উন্নয়ন, সমতার লক্ষ্য ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে মহিলা

বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি সুস্পষ্ট জাতীয় বিবৃতি (National Statement) প্রণয়ন করে তা জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার (National Action Plan) সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অনেকেই পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের বাস্তব চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। যেমন- দারিদ্র্যের একটি অন্যতম সূচক হলো দৈনিক ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরির খাদ্যের যোগান বিদ্যমান থাকা। পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে ৬৮.৭৫% মহিলাই উক্ত পরিমাণ খাদ্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাছাড়া দারিদ্রের অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যই এ সকল মহিলার পরিবারে বিদ্যমান। ঋণ গ্রহীতা এ সকল মহিলা যে চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে তা প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমেয়। সঞ্চয়, ঋণ দান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বিষয়টি একটি সাফল্যজনক উদ্যোগ বলে মনে হলেও বাস্তবে তা সত্য নয়। যথার্থ প্রশিক্ষণের অভাব, বিশেষায়িত পেশায় মহিলাদের অপর্যাপ্ত দক্ষতা, বর্তমান ঋণের পরিমাণ এবং তা বরাদ্দ করার ও পরিশোধের উপায়, স্বল্প বিনিয়োগ এবং অপ্রতুল উদ্বৃত্ত- এসবই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দেশীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে দরিদ্রতা হয়তো সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। কিন্তু সহনশীল ও গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্মসূচি, কেন্দ্রপ্রান্ত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের দৃঢ় অঙ্গীকার চরম দারিদ্র্যতার কাঠিন্যকে খানিক হলেও তরল করতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

আখতার, তাহ্‌মিনা (১৯৯৫) *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট।* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

আহমেদ, নাসির উদ্দীন, মনজুরুল হক (১৯৯৩) *প্রকল্পের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও প্রকল্পচক্র।* নাসির উদ্দীন আহ্‌মেদ ও ডক্টর মোহাম্মদ তারেক (সম্পাদিত) উন্নয়ন অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

ইয়াসমিন, তাহেরা (১৯৯৪) *মহিলা, কাজ ও এনজিও এক বাস্তব চিত্র।* ঢাকাঃ গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৪) *বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি।* ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা।

উইমেন ফর উমেন (১৯৯৫) *নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান।* ঢাকা।

কাফী, এ শরীফ (১৯৯৩) *দুর্যোগ ও দুস্থ নারী বারোটি ঘটনা সমীক্ষা।* ঢাকাঃ প্যাক্ট বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সম্মিলিত প্রতিবেদন। ঢাকাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বেগম, নাজনিন নুর (১৯৯২) *উপার্জন ও সামাজিক অবস্থান ঃ নীলগঞ্জের মহিলা।* ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।

বেগম, মালেকা (১৯৯৬) *নারীর চোখে বিশ্ব ঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।* ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ।

মঈন, জুলিয়া (১৯৯৮) *গ্রামীণ কর্মজীবি মহিলাদের ভূমিকা, মর্যাদা ও পরিবর্তনের ধারাঃ একটি গ্রাম পর্যায় সমীক্ষা।* সমাজ নিরীক্ষণ, নং ৬৮, ঢাকা।

মওদুদ, বেবী (১৯৯৪) *বাংলাদেশের নারী।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী।

সালাউদ্দিন, খালেদা (১৯৯০) *আধুনিক সমাজ ও বাংলাদেশের নারী।* ঢাকাঃ পালক পাবলিশার্স ।

হোসেন, আমজাদ (১৯৯৫) *বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দুরীকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি।* ঢাকাঃ পড়ুয়া প্রকাশনী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৪) বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৩-৯৪) ঢাকা। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮) বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৭-৯৮) ঢাকাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর।

দৈনিক সংবাদ (৬/৭/১৯৯৯)।

দৈনিক সংবাদ (১৮/০১/২০০০)।

দৈনিক ইত্তেফাক (৭/০২/২০০০)।

নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, নারীর আয়, কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ।(১৯৮৬) উবিনীগ কর্মশালা, ঢাকা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (২০০০), বার্ষিক ডায়রী (১৯৯৯), ঢাকা।

Akther, Salma (1998) *Women and development in the Third World*, Exogenous and Endogenous Factors : *NGOs and Empowerment of Women.* Social Science Review, Vol.-15,No-1.

Duza, Asfia and Hamida Akther Begum (1993) *A perspective of Gender and Development in Bangladesh.* Dhaka: Women for Women.

Planning Processes and Women's Development (1997). Vol-3, Institutional Review of WID *Capability of the government of Bangladesh.* Dhaka: MWCA.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

ঢাকা মহানগরীর পেশাঃ গতি ও বৈপরীত্য

আনু মুহাম্মদ *

Occupational Matrix: Dynamics and Direction of a Peripheral Economy: A Case of Dhaka City.

Anu Muhammad

Abstract : This article is an outcome of a study conducted in Dhaka city over people from across different occupations and income groups. It attempted an investigation to understand the impact of dynamics and direction of the Bangladesh economy on its labour force. The study findings include emergence of new occupations those are mostly service oriented and highly vulnerable in nature. Low income and insecured jobs have become inevitable container of huge uprooted rural people. High income occupations were also seen which are mostly linked with foreign agencies or big business or trading groups. Decline of productive sectors and rise of 'supper market' and service oriented economy linked with mobility of international capital has been shaping and reshaping the faces of the people of Dhaka city in both poles, i.e. rich and poor.

একটি সমাজের পেশা সেই সমাজ ও অর্থনীতির ধরন, কাল এবং তার যাত্রাপথ নির্দেশ করে, নির্দেশ করে সাংস্কৃতিক ধরনও। পেশা বিশ্লেষণ করলে বোঝা সম্ভব ঐ সমাজের গতি প্রকৃতি। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে গত আড়াই দশকে ঢাকা মহানগরীতে যে অসংখ্য পেশা তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত পুরো দেশের অর্থনীতির ভাঙন ও গঠন। এই পেশাগুলোর মধ্যে বেশ কিছু পুরনো কিন্তু বহু সংখ্যক নতুন। যেগুলো পুরনো সেগুলো আর পুরনো ধাঁচে সবগুলো নেই। নতুনগুলোর অনেকগুলোই আগে ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধ ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ- এই দুমাস ধরে ঢাকা শহরের দুই শতাধিক পেশার সহস্রাধিক মানুষের মধ্যে পরিচালিত গবেষণা কাজের উপর ভিত্তি করে লিখিত। যাদের উপর অনুসন্ধান চালানো হয় তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ,

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

শিশু-বৃদ্ধ সকলেই ছিলেন। এই অনুসন্ধানে ঢাকা শহরের পেশাগুলো দেখতে গিয়ে সম্পর্কিত বহু বিষয় আমরা গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। আমরা সেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি, কথা বলেছি, তথ্য বিশ্লেষণ করেছি। এই গবেষণায় যে সব প্রশ্নের উত্তর আমরা অনুসন্ধান করেছি সেগুলো হল নিম্নরূপঃ

ক) গত কয়েক দশকে কি কি নতুন পেশা তৈরি হয়েছে? পুরনো পেশাগুলোর হাল কি? পেশার গঠন-ভাঙনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ধরন কি ভূমিকা পালন করছে?

খ) যে পেশাগুলো নতুন তৈরি হয়েছে সেগুলোর ধরন কি? এগুলোর কয়টি উৎপাদনের বা দেশের ভেতরে মূল্য সংযোজনের সঙ্গে সম্পর্কিত? কয়টি সম্পর্কিত ব্যবসার সঙ্গে এবং কয়টি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বা যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত?

গ) নতুনভাবে তৈরি পেশাগুলোর আয়, নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব কেমন?

ঘ) গত আড়াই দশকে উচ্চতম আয় ও ন্যূনতম আয় অনুপাতের ধরন।

ঙ) বিভিন্ন পেশায় আয় ও কাজের সীমা; মাসিক ও ঘন্টা প্রতি আয়।

এসব বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ আমাদের নিজস্ব গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বিত করেই বর্তমান লেখাটি তৈরি করেছি। তবে এই বিষয়ে না পেলেও সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন গবেষণা তথ্যও আমরা এই সঙ্গে পর্যালোচনা করেছি।

নতুন পেশা, নতুন বিনিয়োগ

স্বাধীনতার পর গত দুই দশকেরও বেশি সময়ে যে পেশাগুলো এই সমাজে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে যাদেরকে বিশেষভাবে সনাক্ত করা হয়েছে এবং পুরনো পেশাগুলোর পাশাপাশি যাদেরকে আমরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছি সেগুলোর মধ্যে আছে: গার্মেন্টস শ্রমিক, নার্সারি কর্মচারী, ফুলের দোকান শ্রমিক, বেকারি কর্মচারী,

হস্তসামগ্রীর দোকানের কর্মকর্তা ও 'সেলস গার্ল' কম্পিউটার অপারেটর, বেসরকারী হাসপাতালের নার্স, কিন্ডারগার্টেন-কোচিং সেন্টারের শিক্ষক, ম্যাক্সি চালক, মানি চেঞ্জার, ফোন-ফ্যাক্স-ই-মেইল দোকানের মালিক-কর্মচারী, ডিশ ব্যবসায়ী, প্যাথিড্রিন ব্যবসায়ী, ফেনসিডিল ব্যবসায়ী, বেসরকারী উচ্চ বেতনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মকর্তা, দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা, গবেষক-কনসালট্যান্ট, গবেষণা-নির্মাণ সংস্থার অংশীদার মালিক, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দালাল (লবিষ্ট), ব্যয়বহুল বাস বা রেস্তোরাঁর শিক্ষিত কর্মী, বিজ্ঞাপন মডেল, শেয়ার ব্যবসায়ী, বিউটি পার্লারের কর্মী, ফ্যাশন ডিজাইনার, বেসরকারী স্থপতি সংস্থার কর্মী প্রভৃতি।

গত ২৮ বছরে পুরনো পেশাগুলোর মধ্যে কি পরিবর্তন হলো আর নতুন কি পেশা তৈরি হলো তা প্রধানতঃ নির্ভর করে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ধরনের প্রধান প্রবণতার উপর।[১] গত দুই দশকে যে সব প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্র দ্রুত প্রসার লাভ করেছে সেগুলো হলঃ নির্মাণ ফার্ম, আইন ফার্ম, ঠিকাদারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিউটি পার্লার, বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান, ই-মেইল-ফোন-ফ্যাক্স, কম্পিউটার বিপনন ও প্রশিক্ষণ, রেন্ট-এ-কার, সুপার মার্কেট, হাউজিং, কোচিং সেন্টার, বেসরকারী হাসপাতাল-ক্লিনিক, স্পোকেন ইংলিশ, কিন্ডারগার্টেন-একাডেমী: ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, বায়িং হাউজ, সংগঠিত যৌন ব্যবসা, প্রকাশনা, হস্তশিল্প বিপণন, এনজিও, ভিসা-ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, সিকিউরিটি এজেন্সী, গার্মেন্টস, গোপন (বেআইনী) শিল্প, ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁ, ব্যয়বহুল বাস, বেসরকারী বিমান, হুন্ডি ব্যবসা, আইনী বে আইনী মাদক দ্রব্য ও অস্ত্র ব্যবসা ইত্যাদি।

বিনিয়োগ ও পেশায় শিল্প এবং নারী শ্রমিক

বিনিয়োগ ধরন বিশ্লেষণ করে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আনু মুহাম্মদ: বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র, ২০০০।

অর্থনীতিতে উৎপাদনী খাতের অবস্থান প্রান্তিক। সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন সূত্রের তথ্য তো বটেই এমনিতে খালি চোখেও গত ২৮ বছরে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির মূল ধাঁচটা বোঝা সম্ভব। ১৯৭২ সালে জাতীয় আয়ে শিল্পের অংশীদারীত্ব ছিল শতকরা ৯ ভাগের কিছু বেশি। ২৮ বছরে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের, পুরনো সংজ্ঞায়, এই অনুপাতের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। পাশাপাশি কৃষির অনুপাত কমেছে। বেড়েছে ব্যবসা-নির্মাণ খাত। এই সময়কালে গার্মেন্টসসহ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে পুরনো অনেক সরকারী-বেসরকারী শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে নীট শিল্পায়ন উল্লেখযোগ্য নয়। একই কারণে শিল্প শ্রমিক নামের পেশাটির মধ্যেও জনসংখ্যার তারতম্য হয়নি। এই সংখ্যা গড় পড়তা ৩০ লাখের মতোই আছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার, ২০০০)।

কিন্তু কথাটা এখানেই শেষ করলে হবে না। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, শিল্পশ্রমিক পেশার সংখ্যায় কোন পরিবর্তন না ঘটলেও এর গাঠনিক পরিবর্তন যেটা হয়েছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন শিল্পশ্রমিকের লিঙ্গীয় গঠন ভিন্ন, নারী শ্রমিকের অনুপাত আগে যেখানে ছিল শতকরা ৫ ভাগেরও কম সেখানে এখন তা শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি। গার্মেন্টস নামক আধাশিল্প আধা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সূত্রেই নারী শ্রমিক পরিচয়ের সামাজিক শক্তি বিশেভভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভালমতো টিকে আছে বা বিকাশমান অবস্থায় আছে সেগুলো হল প্রধানতঃ গার্মেন্টস, গোপন শিল্প, এবং ক্ষুদ্র শিল্প। গোপন ও ক্ষুদ্র শিল্প অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন। এসব শিল্পের শ্রমিকও প্রধানত নারী। তাছাড়া দোকান, দিনমজুরি ইত্যাদিতেও নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে।[২]

শিল্পায়নের ঘাটতি ও বিকল্প কর্মক্ষেত্র

ঢাকা শহরে একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের পেশাগুলোর ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক পেশার আধিক্য খুব বেশি। এর কারণ

২. অধিকতর আলোচনার জন্য, আনু মুহাম্মদ : নারী, পুরুষ ও সমাজ, ১৯৯৮।

অর্থনীতির ধরনের মধ্যেই রয়েছে। আগেই বলেছি, নতুন হওয়া এবং বসে যাওয়া শিল্পগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশে নীট শিল্পায়ন উল্লেখযোগ্য নয় (Task Forces, 1999)। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে একটি শিল্পশ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠা যেমন সম্পর্কিত তেমনি তা প্রকৌশলী, রসায়নবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ, ব্যবস্থাপক ইত্যাদির মতো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলারও তাগিদ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের দুর্বলতার কারণে নিম্ন আয়ের পেশাগুলো যেমন ভঙ্গুর, অনিশ্চিত, অসংগঠিত অবস্থায় আছে তেমনি মধ্য আয়ের বিশেষায়িত পেশাগুলোও এখানে অনিশ্চয়তা, অসন্তুষ্টি, অকার্যকারিতার মধ্যে আছে। তুলনায় সেসব পেশা সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে যেগুলো কালোটাকা, ব্যবসা বা বিদেশী বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মধ্যবিত্ত, ডিগ্রীপ্রাপ্ত তরুণ তরুণীদের কর্মসংস্থানের সঙ্গে এখন শিল্পায়নের সম্পর্ক তাই খুবই ক্ষীণ। এখন তাই এদের পেশা সম্পর্কিত চিন্তা বা সম্ভাবনায় যে সব ক্ষেত্র সামনে আসে তার মধ্যে বিদেশ গমন এবং এনজিও প্রধান। এনজিও এ যাবত দ্রুত সম্প্রসারণশীল একটি কর্মক্ষেত্র। এনজিওর মধ্যে আবার নানা রকম আছে, ধরন আছে। আয়তন আর ক্ষমতার দিক থেকে অনেক তফাৎ আছে। কিছু এনজিও বৃহৎ গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর মতোই। ত্রাণ ও বাণিজ্য এখন একাকার হওয়ায় বহুবিধ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ এখন এনজিওর মাধ্যমেই হচ্ছে। লক্ষাধিক মধ্যবিত্ত তরুণ তরণী এখন এনজিওতেই কাজ করেন।[৩] এনজিওতে পেশার নিশ্চয়তা, কাজের সময় এবং বেতনের ধরন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি। বেতন উপরের দিকে দেশের গড় ধারার তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু নীচের দিকে মোটামুটি অন্য সরকারী সংস্থার মতো বা তার তুলনায় খারাপ। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত কেউ এখানে হয়তো শুরু করেন ৩ থেকে ৪/৫ হাজার টাকা দিয়ে

---

৩. এনজিও কার্যক্রমে বিবর্তন, মেরুকরণ, অগ্রাধিকার পরিবর্তন ইত্যাদির সর্বশেষ চিত্র পর্যালোচনার জন্য দেখুন, আনু মুহাম্মদ: বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল (২য় সংস্করণ), প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

যেখানে সরকারী পদে বেতন কমবেশি ৫ হাজার। কিন্তু উপরের দিকে সরকারী-আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ বেতন যেখানে ১৫ হাজার (নির্ধারিত) সেখানে বৃহৎ এনজিও বা ব্যবসায়িক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় এ রকম পর্যায়ের বেতন কার্যত বা শুধু টাকায় ১ লক্ষ অতিক্রম করে। এসব সংস্থায় পেশার অনিশ্চয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি, কর্মঘন্টাও বেশি। এনজিওর মাধ্যমে নিম্নতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত মেয়েদের কর্মসংস্থান তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে, তবে তা প্রধানতঃ গ্রামে।

মেড ইন থেকে মেড এজঃ সুপার মার্কেট থেকে ফুটপাত

বাংলাদেশে বিদেশী পণ্যের যে একচ্ছত্র আধিপত্য আছে তাকে কিছুটা হলেও যারা চ্যালেঞ্জ জানায় তা হল ক্ষুদ্র এবং তথাকথিত গোপন বা বেআইনী শিল্পপ্রতিষ্ঠানই। আমরা আমাদের গবেষণা থেকে দেখেছি যে, যে কোন বিদেশী পণ্য দেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গে এর আরেকটি সংস্করণ এখানে বের হয় এবং 'মেড ইন' এর স্থানে 'মেড এজ' ছাপ নিয়ে ওটি বাজারে উপস্থিত হয়। যে মধ্যবিত্ত বিদেশী পণ্য কিনতে পারেন না তারা এটাই কেনেন। ক্রমবর্ধমান হারে আসা বিদেশী পণ্য বাজারজাতকরণে যে রকম একের পর এক নির্মিত হচ্ছে সুপার মার্কেট বা প্লাজা তেমনি সে সবের অনুসৃত দেশী পণ্যের বাজারজাতকরণে সে রকম সম্প্রসারিত হচ্ছে ফুটপাত। দুদিক থেকেই বিক্রেতা পেশায় এখন অনেক মানুষের ভিড়। 'সুপারমার্কেট' বা 'প্লাজা' বা 'দোকান'-এ হচ্ছে কর্মচারী, আর ফুটপাতে হকার। ফুটপাতের হকার আবার নিজেই মালিক নিজেই শ্রমিক। আমাদের অনুসন্ধান থেকে আমরা দেখেছি, সব সময় এই হকার নামক বিক্রেতারা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। একদিকে পুলিশ আর অন্যদিকে মাস্তানের হামলার ভয়। তটস্থ হকারদের বস্তা নিয়ে লুকানোর চেষ্টা করবার দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। তাদের বস্তা কেড়ে নেয়া, থানায় নিয়ে তোলা এগুলো নিয়মিত দৃশ্য। মাস্তান ও পুলিশ দু'জায়গাতেই তাদের নিয়মিত খাজনা দিতে হয়। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হকারেরা তাদের দিনের আয়ের শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশি খাজনা হিসেবে দিয়ে থাকেন। এই হার যে কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর দেয়ার হারের চাইতে অনেক বেশি।

সারণী ১। বিনিয়োগ: সুপার মার্কেট ও ফুটপাত

বিষয়	ফুটপাতের হকার	সুপার মার্কেট বা প্লাজা
প্রাথমিক পুঁজি বিনিয়োগ	২ থেকে ৫ হাজার টাকা	২ থেকে ১০ লক্ষ টাকা
মাস্তান, পুলিশকে দেয় খাজনা	আয়ের গড়পড়তা ২৫%	আয়ের গড়পড়তা ৫%
ক্রেতা	নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত	মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত
বিক্রয়ের পণ্য	প্রধানতঃ দেশী	প্রধানতঃ বিদেশী
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা	নেই	আছে
অনিশ্চয়তা	সর্বক্ষণ	নেই
পেশা	উদ্যোক্তা-মালিক-কর্মচারী অভিন্ন	উদ্যোক্তা, দোকান কর্মচারী, মার্কেট কর্মচারী

উৎসঃ নিজস্ব অনুসন্ধান

নির্মাণ কাজ ও 'কালোটাকা'র সক্রিয়তা [৪]

গত দু'দশকে বাংলাদেশে নির্মাণকাজের প্রসার হয়েছে বেশ, হাউজিং সোসাইট এখনও ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশ লাভজনকই বটে। এই নির্মাণকাজের প্রসার একদিকে যেমন অবকাঠামো খাতে বিদেশী বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত অন্যদিকে দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। নির্মাণকাজকে অনেক সময়ই শিল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই শব্দের পাইকারি ব্যবহারে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এবং সামগ্রিক বিশ্লেষণ অস্পষ্টতায় আক্রান্ত হতে পারে। এটি পরিষ্কারভাবে বলে দেয়াই ভালো, নির্মাণকাজ এর ধরন আলাদা। অন্যান্য শিল্পের (ম্যানুফ্যাকচারিং) সঙ্গে তাকে মেশানো ঠিক নয়।

নির্মাণকাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রী, রডমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী পেশায় যে রকম লোক বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে স্থপতি ও প্রকৌশলী পরিচয়ের মানুষও। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য বর্তমান হারে আগে কখনও ঢাকায় নির্মাণ

৪. প্রচলিত অর্থে এখানে 'কালোটাকা' বলা হয়েছে। এই শব্দের ভেতর যে বর্ণবাদী সুর আছে তা থেকে মুক্ত থাকবার জন্য 'দুর্বৃত্ত অর্থনীতি' বলা শ্রেয়।

কাজ হয়নি, এই হারে বহুতল ভবনও আগে তৈরি হয়নি। নির্মাণকাজ তাই এখন সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার। নির্মাণ ফার্ম, আর্কিটেচারাল ফার্ম এখন বিকাশমান ক্ষেত্র। ঠিকাদারী এখন ব্যক্তিগত পেশার চাইতে অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক। আগে নির্মাণের ডিজাইন থেকে শুরু করে ফিনিশিং পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে এক রাজমিস্ত্রীই করতো, এখন তা নেই। কাজ বড় হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী, যৌথ মালিকানায়, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে। শ্রম বিভাজনও গভীর হয়েছে। অনেক পেশার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

শুধুমাত্র নির্মাণেই শেষ নয়, নির্মাণের পর ঘর সাজানোর ব্যাপারটিও ক্রমেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে যাচ্ছে। ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর এখন একটি টেকসই পেশা। হাউজিং বা সুপারমার্কেট ছাড়াও ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোটি টাকার বাড়ি নির্মাণের ঘটনা খুব সুলভ। এখন লক্ষ টাকায় বাড়ি ভাড়াও হচ্ছে। এসব বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে যে মালিকেরা জড়িত তাদের অধিকাংশের আয়ের অনুসন্ধান করতে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে আয়-উপার্জনের আরেক জগৎ, যাকে এক কথায় 'কালো অর্থনীতি' বলে। বিভিন্ন হিসাবে বাংলাদেশের বার্ষিক মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩০ শতাংশ এই অর্থনীতিতে তৈরি হচ্ছে যা জাতীয় আয়ের হিসাবে আসে না (UNDP, 1999)।[৫] বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে এর সর্বব্যাপী প্রভাব সে কারণে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এই অর্থনীতি যে ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতা থেকে হয় সেগুলো হল: মাদক, অস্ত্র, পর্ণোগ্রাফিসহ বিভিন্ন পণ্য চোরাচালানী ও কালোবাজারী (অন্য ভাষায় বেআইনী আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)। বিদেশী সংস্থাসমূহের বিনিয়োগ সুবিধা দেবার জন্য সরকারী প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে বিপুল ঘুষ, বিদেশী সাহায্য ভাগ বাঁটোয়ারা, ওভার ও আন্ডার ইনভয়েসিং, সরকারী উন্নয়ন বাজেট লোপাট, ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ, যৌন ব্যবসা ও নারী পাচার, দালালী, ছিনতাই-ডাকাতি, ইত্যাদি।

---

৫. সম্প্রতি সমাপ্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ এবং বিশেষ বক্তৃতায় রেহমান সোবহান অর্থনীতির এই প্রবণতার ক্রমবিস্তারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আসাদুজ্জামান গোপন অর্থনীতির উপর গবেষণা কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এইসব তৎপরতা দিয়ে জিডিপি বাড়ে। জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নও সেজন্য এখন জোরদার হচ্ছে।

এসব তৎপরতার লাভজনক অবস্থার ফলে এগুলোকে ঘিরে নানা পেশা দাঁড়াচ্ছে এবং সম্পর্কিত পুরনো অনেক পেশাও নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। যেসব সরকারী পেশা কালোটাকা উপার্জনের জন্য সুবিধাজনক সেগুলোতে ভিড় বাড়ছে। তাছাড়া সন্ত্রাসী, মাস্তানের চাহিদাও এই অর্থনীতির প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবেই বাড়ছে। 'কালো' টাকা সাদা করবার জন্য দেশে-বিদেশে বাড়ি বানানো, জমি কেনা, চাঁদা বা রাজনীতিতে বিনিয়োগ, চলচ্চিত্র তৈরি ইত্যাদি পথ সুবিধাজনক। সে কারণে বিনিয়োগের পথ ধরে সেই অনুযায়ী পেশাও তৈরি হচ্ছে।

প্রকৃত আয়ের অবনতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বাণিজ্যে বসতি

এমনিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক এবং সরকারী-আধা সরকারী-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়মিত বেতনের প্রকৃত চেহারা হিসাব করলে একটা ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর গত ২৮ বছরে সাধারণভাবে শ্রমিকদের এবং সরকারী-আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সরকারী স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনে প্রকৃত আয় বাড়েনি বরঞ্চ ৭১-৭২ কে ভিত্তি করে হিসাব করলে প্রকৃত আয় কমেছে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট বেতনভুকদের মধ্যে অন্য আয় সন্ধান বেড়েছে। একই কারণে পরিবারের নারী সদস্যদের উপার্জনী কাজে অংশগ্রহণ করবার হার অনেক বেড়েছে। অন্যদিকে স্কুল কলেজের শিক্ষকদের টিউশনি, কোচিং সেন্টার, নোটবই লেখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঠিকাদারী গবেষণার দাপট নিয়মিত দায়িত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু এসব উপরি আয় গ্রহণ সবাই করছেন না বা করতে পারছেন না।

কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল হোম ইত্যাদি এখন স্কুল-কলেজের চাইতে বেশি সচল। একজন শিক্ষক যেখানে স্কুল বা কলেজ থেকে বেতন পাচ্ছেন ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা, সেখানে টিউশনি, নোটবই বা কোন কোচিং সেন্টারে যুক্ত থেকে তিনি আয় করছেন ২০ থেকে ৩০ হাজার। এঁদের সংখ্যা কম হলেও তাঁদের দাপটে স্কুল-কলেজের স্বাভাবিক গতি অস্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বেতন পেতে পারেন যেখানে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা, কনসালট্যান্সীতে

সেখানে আয় হবে ৩০ থেকে ৭০/৮০ হাজার কখনো কখনো লক্ষাধিকও। কাজেই এসব পেশার দ্রুত বৃদ্ধি, এগুলোতে ভীড় বৃদ্ধি পাবারই কথা। তাছাড়া, গবেষণা খাতে তহবিলের প্রবাহ বেশ আকর্ষণীয়। দারিদ্র থেকে নারী- ইত্যাদি বিষয়ে তহবিল দাতাদের আগ্রহ এখানকার 'গবেষক'-শিক্ষকদের উল্লাস ও উদ্দীপনার অন্যতম অবলম্বন। এগুলোতে কাজ যাই হোক সমাজে নতুন পেশা ও তৎপরতা সৃষ্টিতে এগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেসরকারী উচ্চ ব্যয়বহুল স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এর চাহিদা এবং এর ব্যবসাযোগ্যতা দুই কারণেই। এসব কারণে বিদ্বৎসমাজকে ঘিরে বা বিদ্বৎসমাজকে নিয়ে বাণিজ্যিক জগৎ আগের যে কোন সময়ের তুলনায় জমজমাট। কোচিং সেন্টার থেকে গবেষণা ফার্ম কিংবা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সবই শতকরা ১০০ ভাগ বাজারের টানেই পরিচালিত। পেশাও তাই গঠিত হচ্ছে সেভাবেই।

একই ঘটনা ডাক্তারদের বেলাতেও সত্য। সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারের বেতন একই রকমভাবে প্রকৃত অর্থে কমেছে। এসব হাসপাতালেরও জীর্ণদশা। পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে বাণিজ্যিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টার। শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে বিদেশী বিনিয়োগও হতে যাচ্ছে।

স্পোকেন ইংলিশ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির প্রসারের সঙ্গে বিদেশ গমন ও বর্তমানে চাকরি চাহিদার ধরন সরাসরি সম্পর্কিত। এগুলো একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্মানবোধের সাথেও যুক্ত। চাহিদা ও যোগান দুদিক থেকেই এগুলো প্রসারমান।

পরিবহণঃ নতুন ও পুরনো

পরিবহণ-এর মধ্যে বিশেষভাবে সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়েছে গত দুদশকে। আন্তঃজেলা যাত্রীবাহী বাস দুই দশকের ঘটনা, এর আগে ট্রেনই ছিল আন্ত:জেলা প্রধান পরিবহণ। গত কয়েক বছরে বিলাসবহুল বাস নগর পরিবহণ ও আন্ত:জেলা পরিবহণ দুক্ষেত্রেই স্বাভাবিক

ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। পরিবহণ খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে অনেক। বাস-ট্রাকের আমদানীও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। মিনিবাসও। সাথে সাথে বাস-ট্রাক এর বডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে ড্রাইভার, কন্ডাক্টর পেশার মানুষ। কন্ডাক্টর, হেল্পার বলে যে পদগুলো আছে সেগুলোতে প্রধানতঃ শিশু-কিশোররাই কর্মরত। বেতন এখানে নেই কিংবা যৎসামান্য। নিরাপত্তা বা নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার কথা অবান্তর।

গত দু'দশকে বিশেষতঃ ৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে খুবই দ্রুত হারে। এর সঙ্গে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প, এনজিও, ঋণখেলাপী, বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ড্রাইভার, মেকানিক ইত্যাদি পেশার চাহিদাও বেড়েছে। ঢাকার জনপরিবহণে ইদানিংকালে যুক্ত হচ্ছে ট্যাক্সি, ম্যাক্সি, এসি বাস ইত্যাদি। এক সময়ে বিকল্প ট্যাক্সি চালু হয়েছিল। একে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের 'নতুন দিগন্ত' বলে উল্লেখও করা হয়েছিল তখন। বিভিন্ন কারণে টেকেনি। এখন আবার ট্যাক্সি চালু হচ্ছে, তবে সেভাবে নয়।

যাত্রীসংখ্যা বিবেচনা করলে রিকশা এখনও ঢাকার প্রধান পরিবহণ। আইনী-বেআইনী বিভিন্নভাবে রিকশা চলছে। রিকশার সঙ্গে সম্পর্কিত পেশা ও মানুষের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। ঢাকা শহরের রিকশার সঙ্গে যুক্ত আছে যে পেশাগুলি সেগুলো হলোঃ বডি নির্মাতা, শিল্পী, চালক (চলতি কথায় রিকশাওয়ালা), মেকানিক, গ্যারেজ দেখাশোনাকারী প্রভৃতি। শুধুমাত্র ঢাকায় রিকশার সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ এঁরা সবাই মিলে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা এখন ১৫ লাখেরও বেশি। বছরে রিকশার মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় ৭০০০ কোটি টাকার 'মূল্য' তৈরি হয়, ঢাকায় এর পরিমাণ প্রায় ২০০০ কোটি টাকা।[৬] ঢাকায় একদিকে যেমন রিকশা ও রিকশাচালকের সংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি রিকশার আরোহীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রিকশা এখন গ্রাম থেকে স্থায়ীভাবে উঠে আসা কিংবা অস্থায়ীভাবে কাজ করতে আসা মানুষদের জন্য একটি উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্র।

---

৬. বিবিএস প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরীপ, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সিটি কর্পোরেশন ও নিজস্ব অনুসন্ধান থেকে হিসাবকৃত।

তথ্য প্রযুক্তি ও বিনোদন সাম্রাজ্য

তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশে এখন বাংলাদেশ সরাসরি যুক্ত। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি চ্যানেলে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা একইসঙ্গে পেশার গঠনকেও প্রভাবিত করেছে। এই সুবিধা এখন ক্রমেই গণরূপ নিচ্ছে। আগে যেখানে এই সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হতো লক্ষ টাকার বেশি সেখানে এখন তা ২০০ টাকাতেই পাওয়া সম্ভব। ঢাকা শহরের প্রতিপাড়ায় এজন্য সংস্থা গড়ে উঠেছে। প্রথম দিকে ক্ষুদ্রায়তনে এসব উদ্যোগ ছিল, ক্রমে এর মধ্যেও দ্রুত উঠানামা হয়েছে এবং যৌথ সংস্থা বা একচেটিয়া সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভিডিও দোকানের ব্যবসা এক সময় বেকার তরুণদের আকর্ষণীয় পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখন তা নেই। যারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকে এখন ডিশব্যবসায় এসেছেন, যদি এখনও বিদেশে না গিয়ে থাকেন।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফোন-ফ্যাক্স চালু হয়েছে ৯০ দশকেরই প্রথম দিকে। গত বছরখানেকের মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ই-মেইল চালু হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য, আত্মীয়স্বজনদের চাকুরি, পড়াশোনা, বসতিস্থাপন ইত্যাদি এদিকে যে যোগাযোগের তাগিদ তৈরি করেছে সেটা পূরণ হচ্ছে এই সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আবার এই সুবিধার কারণে যোগাযোগের নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে। বিনোদন বাণিজ্যেরও অনেক প্রসার হয়েছে একই সময়ে।

বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং সেই সঙ্গে বিপণনের নানাবিধ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মডেলিং পেশাও এখন আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। ফ্যাশন, ডিজাইন ইত্যাদি এখন আগের তুলনায় মধ্যবিত্তের বড় মনোযোগের বিষয়। এনজিও নির্ভর হস্তশিল্প সামগ্রীর দোকানগুলো এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। রূপচর্চা, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিউটি পার্লার, প্রসাধন সামগ্রী, কনসালট্যান্সী ইত্যাদির বাজার এখন বেশ জমজমাট। এগুলোর পাশাপাশি প্যাকেজ সংস্কৃতি অডিও-ভিডিও তৎপরতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এটাকে কেন্দ্র করেই। বেসরকারী টিভি চ্যানেল, স্যাটেলাইট বাংলা চ্যানেল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এগুলো আরও বিকশিত হবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু এই সঙ্গে এটা অন্ততঃ উল্লেখ করা দরকার যে, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন, রূপচর্চা, স্যাটেলাইট চ্যানেল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ বিশেষতঃ ভারতীয়

বিভিন্ন সংস্থার সংযুক্তি উল্লেখযোগ্য হারে ঘটতে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশী-বিদেশী মিলিয়ে শুধু বিজ্ঞাপন খাতেই মোট বিনিয়োগ ৪০০ কোটি টাকারও বেশি।[৭]

ধর্মীয় পেশাজীবী

গত দু'দশকে ধর্ম-নির্ভর পেশার আয়তনও বেড়েছে। এর নতুন মাত্রাও যোগ হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশাগুলো সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে আমরা এক কথায় ধর্মীয় পেশাজীবী বলতে পারি। আমরা সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখি, গত দু'দশকে সরকারী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় তেমন না বাড়লেও মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে ৭গুণ (BANBEIS, 1974, 1981, 1991; মুতি, ১৯৯৬)। এছাড়া একই সময়কালে সাধারণ স্কুলেও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা চালু হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করবার পেছনে ধর্মের চাইতে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিই যে বেশি কার্যকর ছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান হয়েছে। এমনিতে গরীব পরিবারের ছেলেরাই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। কাজেই এই শিক্ষার পর সারাদেশে সামগ্রিক কর্মসংস্থানের সমস্যার মুখে এটা কর্মসংস্থানের বড় অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসাগুলোতে নিয়োজিত আছেন প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষক এবং স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষক আছেন ১ লক্ষেরও বেশি। এছাড়া আছেন ইমাম, মুয়াজ্জিন; মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার ব্যবস্থাপনার ব্যক্তিবর্গ। বর্তমানে অডিও-ভিডিও প্রযুক্তিও ধর্মীয় পেশাজীবীরা ব্যবহার করেন। অনেকগুলো এনজিও রাজনৈতিকভাবেই ধর্মীয় পেশার ব্যক্তিদের যুক্ত করে কাজ করতে চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমী দেশগুলো থেকে ধর্মীয় প্রচার ও রাজনীতির জন্য যে তহবিল আসে তা এক্ষেত্রে তৎপরতা অনেক বাড়িয়েছে।

মাসিক আয়, জাতীয় গড় ও ঢাকার বিভিন্ন পেশার অবস্থান

বাংলাদেশের পারিবারিক ব্যয় জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন আয় পর্যায়ে দেশের, শহর এবং গ্রামের, শতকরা কত ভাগ মানুষ অবস্থান করেন তার একটা চিত্র পাওয়া যায় (সারণী ২)। আমরা এখানে সেই তথ্যের সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধান থেকে

---

৭. নিজস্ব অনুসন্ধান, বেসরকারি হিসাবের উপরই এক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়েছে। কেননা এখানে সরকারের কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। সূত্র : বিভিন্ন বিজ্ঞাপণী সংস্থা।

প্রাপ্ত সেই আয়ভুক্ত ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পেশা নির্দেশ করছি। জাতীয় হিসেবে দেখা যাচ্ছে মাসে ৮০০০টাকার বেশি আয় এরকম জনসংখ্যা শতকরা মাত্র ৪.১ ভাগ (BBS, 1998)। মাসে ৮০০০ টাকার বেশি আয়ের যে সব পেশা আমদের অনুসন্ধানে এসেছে তাদের মধ্যে ৮০০০ টাকার অনেক বেশি মাসিক আয়ের পেশা রয়েছে। সুতরাং ৮০০০ টাকার বেশী আয়ের পেশাগুলো আমরা আলাদা করেই দেখাচ্ছি।

সারণী ২। পেশা ও আয়ের বিন্যাস

মাসিক আয় (টাকা)	সারা দেশে এই আয়ভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	সকল শহরে এই আয়ভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার	ঢাকা শহরে এই আয়ের পেশাসমূহ
<১০০০	১০.৬	৩.৪	গৃহশ্রমিক, চকোলেট বিক্রেতা, গার্মেন্টস শ্রমিক, রেস্তোরাঁ 'বয়', দোকান-নার্সারি-আড়তের কর্মচারী, লেদমেশিন শ্রমিক, বেসরকারি স্কুল শিক্ষক, গৃহশিক্ষক, টোকাই, কালা সাবান বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা..
১০০০-২০০০	৪২.৩	২৫.৪	রুটির কারিগর, রিকশাচালক, রিকশা মেকানিক, ফুলের দোকান শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, মাজারের খাদেম, ঝাড়ুদার, স্কুল শিক্ষক, মসজিদ সহকারী, সুরমা বিক্রেতা, বেকারি কর্মচারী, বেসরকারী স্কুল শিক্ষক, মাঠা বিক্রেতা, কুলি, সুইপার, রিকশা শিল্পী, টিয়া পাখী স্বাস্থ্য দেখা, হস্তসামগ্রীর দোকানের 'সেলস গার্ল'।
২০০১-৩০০০	২০.৯	২২.৫	দোকান ম্যানেজার, ছোট দোকানদার, ফল বিক্রেতা, জুতা পালিশ, ফেরীওয়ালা, মসজিদের চাঁদা আদায়কারী, কম্পিউটার অপারেটর, খাবার দোকানের কর্মচারী, মসজিদ কেয়ারটেকার, বেসরকারী হাসপাতালের নার্স, সরকারী হাসপাতালে সিনিয়র আয়া, কিন্ডারগার্টেন-কোচিং সেন্টারের শিক্ষক, গৃহ শিক্ষক, দারোয়ান।

মাসিক আয় (টাকা)	সারা দেশে এই আয়ভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	সকল শহরে এই আয়ভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার	ঢাকা শহরে এই আয়ের পেশাসমূহ
৩০০১-৪০০০	১০.১	১৪.৫	বাসের কন্ডাক্টর, টেম্পো ড্রাইভার, বুট বিক্রেতা, চা-দোকানদার, পত্রিকার হকার, ঠেলাগাড়ি চালক, ভ্যানগাড়ি চালক, আইসক্রিম বিক্রেতা, ছাতা মেরামতকারী।
৪০০১-৫০০০	৬.০	১০.১	সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারী হাসপাতালের নার্স, ছোট দোকানদার, নির্মাণ শ্রমিক, কাঠমিস্ত্রী, গৃহশিক্ষক।
৫০০১-৬০০০	৩.১	৫.৯	সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, 'যৌন শ্রমিক', বেবীট্যাক্সি চালক, বেসরকারী এয়ার হোস্টেল, হাড়িপাতিল বিক্রেতা, মুদি দোকানদার, রডমিস্ত্রী, নার্সারির মালিক, ম্যাক্সি চালক, মানি চেঞ্জার।
৬০০১-৮০০০	২.৯	৬.৯	সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাস ড্রাইভার, মাটির জিনিষের ব্যবসায়ী, ছিনতাইকারী, সাংবাদিক।
৮০০০+	৪.১	১১.৩	৮০০১-১০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাস ড্রাইভার, মাটির জিনিষের ব্যবসায়ী, ছিনতাইকারী, সাংবাদিক। ১০০০১-১৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গাড়ি মেকার, চানাচুর ফ্যাক্টরীর মালিক, ঘটক, ফোন-ফ্যাক্স দোকানের মালিক, ডিশ ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্যাথিড্রিন ব্যবসায়ী, ট্রাক চালক।

মাসিক আয় (টাকা)	সারা দেশে এই আয়ভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	সকল শহরে এই আয়ভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার	ঢাকা শহরে এই আয়ের পেশাসমূহ
৮০০০+	৪.১	১১.৩	১৫০০১-২০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ ফেনসিডিল ব্যবসায়ী, মাছের আড়তদার, ডাক্তার, কোচিং সেন্টারের অংশীদার, বই দোকানের মালিক, ফ্যাক্স মেইল দোকানের অংশীদার, বেসরকারী উচ্চ বেতনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ২০০০১-৩০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ জুয়ার মালিক, বেসরকারী উচ্চ বেতনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা, আইনজীবী। ৩০০০১-৫০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গবেষক-কনসালট্যান্ট, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা, বড় বেকারীর মালিক, ঠিকাদার। ৫০০০১-৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গবেষক-কনসালট্যান্ট, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থার কর্মকর্তা, ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক, দেশীয় ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা। ৭৫০০১-১০০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গবেষক-কনসালট্যান্ট, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা। ১০০০০০+টাকা আয়ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থা ও বৃহৎ এনজিও-র প্রথম সারির কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, গবেষণা-নির্মাণ সংস্থার অংশীদার মালিক, ঠিকাদার, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দালাল (লবিষ্ট)।

উৎস ঃ বিবিএস (১৯৯৮) পারিবারিক ব্যয় জরিপ, ১৯৯৬ ও নিজস্ব অনুসন্ধান।

ঘন্টা প্রতি আয়

ঘন্টা প্রতি আয় মাসিক আয় সম্পর্কিত প্রাপ্ত চিত্র থেকে ভিন্ন হয় তখনই যখন কর্মঘন্টা ও অবস্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত বা প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরেরা সাপ্তাহিক ছুটির ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ, কর্মজীবী নারী-পুরুষ, সাপ্তাহিক ছুটিকে বিলাসিতা বা কর্মহীনতা হিসেবেই দেখে থাকেন। কেননা, তাদের জন্য একদিনের ছুটি মানে একদিনের কাজের পয়সা বাদ দেয়া। কাজের ঘন্টাও তাঁদের অনেক দীর্ঘ। ৮ ঘন্টা শ্রম দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও বাংলাদেশে খুব কম সংখ্যক মানুষই ৮ ঘন্টা কাজ করে প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে পারেন। তাছাড়া নির্দিষ্ট আয়ভোগীদের প্রকৃত আয় কমে যাবার ফলে তাদের বাড়তি সময় কাজ করেই ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এভাবে পরিস্থিতির কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মঘন্টা বেড়ে যায়। নীচে ঘন্টা প্রতি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পেশার মানুষেরা কত আয় করেন তার একটি চিত্র দেওয়া হল। যারা কোন নগদ টাকা পান না, শুধু পেটেভাতে অর্থাৎ থাকা খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করেন তাদের আয়ও ২ টাকা পর্যন্ত হিসেবে ধরা হচ্ছে।

- ২ টাকা পর্যন্তঃ গৃহশ্রমিক, চকোলেট বিক্রেতা, গার্মেন্টস শ্রমিক, রেস্তোরাঁ 'বয়', দোকান-নার্সারি-আড়তের কর্মচারী, লেদমেশিন শ্রমিক, মুদি দোকানের কর্মচারী, টোকাই।
- ২.১ থেকে ৫ টাকাঃ বেকারির কারিগর, রিকশা মেকানিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, গাঁজা বিক্রেতা, ভ্যানচালক, চকোলেট বিক্রেতা, প্রাইভেট ড্রাইভার, দোকান কর্মচারী, মসজিদ সহযোগী, আড়তের কর্মচারী, কুলি, নার্সারি কর্মচারী, সুইপার, ফুটপাতের দোকান সহযোগী, টিয়া পাখী ভাগ্যদেখা, মাজারের খাদেম, ভ্যানচালক, কালা সাবান বিক্রেতা।
- ৫.১ থেকে ৭.৫ টাকাঃ ফুল দোকানের শ্রমিক, ছোট দোকানদার, খাবার দোকানের কর্মচারী, চকোলেট-ফুল-পত্রিকা বিক্রেতা, বেসরকারী স্কুল শিক্ষক, জুতা সেলাই-কালি, রিকশা-শিল্পী, হকার।
- ৭.৬ থেকে ১০ টাকা ঃ রিকশাচালক, বাস কন্ডাক্টর, বুট বিক্রেতা, ঝাড়ুদার, সুরমা বিক্রেতা, দারোয়ান, ঠেলাগাড়ি চালক, মাঠা বিক্রেতা, ম্যাক্সিচালক,

ফেরীওয়ালা, মসজিদের চাঁদা আদায়কারী।

- ১০.১ থেকে ১৫ টাকাঃ টেম্পো ড্রাইভার, হস্তশিল্প দোকানে 'সেলস গার্ল', কাঠমিস্ত্রী, কম্পিউটর অপারেটর, ফল বিক্রেতা।
- ১৫.১ থেকে ২০ টাকাঃ বাস ড্রাইভার, স্কুল শিক্ষক, বেবীট্যাক্সি চালক, হাড়িপাতিল বিক্রেতা, মানি চেঞ্জার।
- ২০.১ থেকে ৩০ টাকাঃ সরকারী কর্মকর্তা, বিমানে ট্রাফিক এসিস্ট্যান্ট, ভাসমান যৌন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক।
- ৩০.১ থেকে ৫০ টাকাঃ এনজিও কর্মকর্তা, কোচিং সেন্টারের অংশীদার, মাটির জিনিসের ব্যবসায়ী, ফেনসিডিল ব্যবসায়ী, ট্রাক চালক, ইনটেরিয়র ডেকোরেটর।
- ৫০.১ থেকে ৭৫ টাকাঃ ছিনতাইকারী, প্যাথিড্রিন ব্যবসায়ী, লেদ দোকানের মালিক, ইন্টারনেট কর্মী, ডিশ এন্টেনা, ফ্যাক্স-ই-মেইল ব্যবসায়ী।
- ৭৫.১ থেকে ১০০ টাকাঃ জুয়ার মালিক, ফ্যাক্স-ই-মেইল ব্যবসায়ী।
- ১০০+ টাকাঃ ফুল দোকানসহ বড় দোকান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক, বৃহৎ দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।

মাসিক আয় থেকে আমরা ঢাকার বিভিন্ন পেশার অবস্থান সম্পর্কে যে চিত্র পাই তা আরও পরিস্কার হয় যখন আমরা তা থেকে ঘন্টা প্রতি আয় বের করি। যাদের কর্মঘন্টা বেশি তাদের মাসিক আয় বেশি হলেও যাদের কর্মঘন্টা কম তাদের তুলনায় ঘন্টাপ্রতি আয় কমে যেতে পারে। আমরা আমাদের বিশ্লেষণে সে রকম ফলাফলই পেয়েছি। কিন্তু সঠিক চিত্র পেতে গেলে আয় ছাড়াও আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করা দরকার। আয় বেশি হলেও নিরাপত্তহীনতা, সামাজিকগ্রহণযোগ্যতা, নিপীড়নমূলক অবস্থা, সাপ্তাহিক ছুটি ইত্যাদি বিবেচনা করলে কোন কোন পেশার অবস্থান অনেক নীচে নেমে যেতে পারে। আমাদের বিশ্লেষণে 'যৌনশ্রমিক' বা 'পতিতা' মাসিক আয়ের দিক থেকে অনেকগুলো পেশা থেকে উপরে অবস্থান করে, কিন্তু তার নিরাপত্তাহীনতা, তার নির্যাতনমূলক অভিজ্ঞতা, সামাজিক সম্মান ইত্যাদি উপর ক্রমবিশ্লেষণ করলে তার অবস্থান দাঁড়ায় সবার নীচে।

একদিকে আয়, অন্যদিকে আয়ের সঙ্গে উপরোক্ত সূচকগুলো বিবেচনা করলে অনেক পেশার অবস্থানই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

বিশ্বায়নের যোগসূত্র

উপরের প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, আইনী-বেআইনী ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান এবং পেশাই গত দু'দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আবার যেগুলোতে আয় বেশি,অস্ত্র-মাদকদ্রব্য ব্যবসা বাদে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, যোগাযোগ ও বিদেশী সাহায্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃহৎ নির্মাণ ফার্ম, বৃহৎ আইন ফার্ম, ঠিকাদারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান, ই-মেইল-ফোন-ফ্যাক্স, কম্পিউটার, সুপার মার্কেট, বিদেশী ডাক্তার ও বিনিয়োগ সম্বলিত ক্লিনিক, স্পোকেন ইংলিশ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, বায়িং হাউজ, হস্তশিল্প বিপণন, এনজিও, ভিসা-ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, রফতানিমুখি দেশি-বিদেশি শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বিদেশী মুদ্রা ও হুন্ডি ব্যবসা ইত্যাদি এর কিছু উদাহরণ। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের পেশার বিকাশ খুবই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর বিশেষত্ব হল এই যে, এগুলোর দেশীয় খুঁটি খুব দুর্বল।

নিম্ন ও উচ্চ আয়ের অনুপাত

নিম্ন ও উচ্চ আয়ের সীমা এখন অনেক ছড়িয়ে গেছে। শুধুমাত্র পেটেভাতে কাজ করবার মতো পেশা ২৫/৩০ বছর আগে বা তারও আগে যেমন ছিল, এখনও আছে। সরকারী চাকুরিতে সর্বনিম্ন আয় ৭২ সালে ছিল কমবেশি ১০০ টাকা, সর্বোচ্চ ছিল ১৫০০ টাকা; এখন তা যথাক্রমে ১০০০ ও ২০০০০ টাকা। আয় অনুপাতের ধরন ১:১৫ থেকে ১:২০ হয়েছে। কিন্তু ২৫ বছর আগের তুলনায় বাড়তি বা উপরি আয়ের সম্ভাবনা বেড়েছে অনেক। সরকারী উচ্চপদে যারা থাকেন তাদের পক্ষে লক্ষ টাকার বাস্তব আয় তৈরি করা খুবই সম্ভব। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, কর, পুলিশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য। সে হিসেব অন্তর্ভুক্ত করলে ব্যবধান আরও বাড়বে।

সারণী ৩ । ন্যূনতম আয় ও উচ্চ আয়ের বিন্যাস

সন	ন্যূনতম আয় ও উচ্চ আয়ের বিন্যাস			
	ন্যূনতম আয়-১	ন্যূনতম আয়-২	উচ্চতম আয়	উচ্চতম ও ন্যূনতম আয়-২ এর অনুপাত
১৯৭২	পেটে-ভাতে	১০০ টাকা	১৩০০০ টাকা	১:১৩০
১৯৯৮	পেটে-ভাতে	৫০০ টাকা	২০০০০০ টাকা	১:৪০০

উৎস ঃ নিজস্ব অনুসন্ধান

বেসরকারী খাতে ন্যূনতম মজুরি বলে কিছু নেই, গার্মেন্টসে ৫০০ টাকা বেতনেও অনেকেই কাজ করছেন। অন্যদিকে বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ এনজিও, গবেষণা, নির্মাণ, বিদেশী সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ টাকার নিয়মিত চাকরি এখন দুর্লভ নয়। দু'লক্ষ টাকার চাকরির সংখ্যা কম কিন্তু আগের যে কোন সময়ের তুলনায় দৃশ্যমান। এনজিও প্রধান, গ্রুপ অব কোম্পানজী-এর পরিচালক-মালিকদের আয়ের বিষয়ে কোন সীমা চিহ্নিত করা কঠিন। এদের আয় টাকার অংকে যত তার থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশে আয়করের চিত্র দেখলে অবশ্য এসব উচ্চ আয়ের মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। বেসরকারি খাতে এখানে নিম্ন-উচ্চ আয়কে একটি সীমার মধ্যে বিবেচনা করলে অনুপাত দাঁড়ায় কমপক্ষে ১ : ৪০০।

ব্যয়ধরনের পরিবর্তন ও নতুন গতিমুখ

উচ্চ আয়ের বিভিন্ন পথ তৈরি হবার ফলে ভোগের ধরনেও তার প্রভাব পড়েছে। ব্যয়বহুল খাবার দোকান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা এভাবেই বিস্তৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার গত দু'দশকে একারণেই অভূতপূর্ব হারে বেড়েছে। চিকিৎসা বা বেড়াতে যাবার জন্য ভারত এই জনগোষ্ঠীর জন্য কোন বিশেষ ব্যাপার নয়, সিঙ্গাপুর বা ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকা যেতে পারবার মতো লক্ষাধিক পরিবার বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে গত দু'দশকে।

অন্যদিকে এক ব্যক্তির আয়নির্ভর মধ্যবিত্ত এখন আর অটুট নেই। নিয়মিত

কাজে প্রকৃত আয় কমে গেছে। দু'তিনজন কাজ করে সংসার সামলানোর চেষ্টা করছেন। এর মধ্য দিয়েই শ্রমবাজারে মধ্যবিত্ত নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এর মধ্যে ভোগ তালিকায় নতুন নতুন অনেক পণ্য যোগ হয়েছে। ব্যয় বেড়েছে। চারদিকে কেনার দ্রব্যের যোগান, বিজ্ঞাপনের প্রসার ও ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকার জন্য মধ্যবিত্ত নানাভাবে পরিকল্পনা করতে থাকে। উপরি আয়ের নানাপথ এখন আর সামাজিকভাবে নিন্দনীয় নয়। কোনভাবে দাঁড়াতে না পারলে, বা আরও ভালভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টায় মধ্যবিত্ত বাইরের বিশ্বের দিকে ছুটতে চেষ্টা করে। পয়সা নিয়ে খোঁজ খবর নেয়া, ফরম পূরণ করা, তদবির করা, রাস্তা দেখানো ইত্যাদি কাজেও পেশা তৈরি হয়েছে।

বাইরে গিয়ে অনেকেই পরিবারের ব্যয়ধরনকে পাল্টে দিয়েছেন, আরও অন্য সদস্যদের মধ্যেও বিদেশ যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। বাইরে গিয়ে আবার দেশে ফিরে নতুনভাবে নিজের পেশা দাঁড় করাচ্ছেন এরকম মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় বেশি দেখা যায়। বাইরে ফাস্টফুডের দোকানে কাজ করে দেশে এসে সে রকম নিজেই একটা দোকান দিচ্ছেন এরকম উদাহরণ ঢাকায় অনেক পাওয়া যাবে। ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় পড়ে সেখানকার কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বা উপদেষ্টা হিসেবে এদেশে কাজ করছেন এরকম ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

শহরমুখী যাত্রা ও পেশার ভাঙন-গঠন

পাশাপাশি ঢাকায় ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ গ্রাম থেকে উঠে আসছেন। উঠে আসছেন উচ্ছেদ হয়ে বা কাজের খোঁজে নিম্ন আয়ের নারী-পুরুষ। এসব পরিবারের মেয়েরাই নারী শ্রমিক হিসেবে ঢাকা শহরের চেহারা পাল্টে দিচ্ছেন। ফুটপাত তাদের প্রথম আশ্রয়। কয়েকলক্ষ মানুষ এখন ঢাকার ফুটপাতেই থাকেন। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে সম্পর্ক, ধ্যান-ধারণা। শ্রমিক মেয়েরা অনেকেই একসঙ্গে মেস করে বা বস্তিতে ঘর নিয়ে থাকেন। তাদের উপর মালিক থেকে মাস্তান পর্যন্ত বিভিন্ন জনের হামলা এমনকি খুন নিয়মিত ঘটনা।

সরকারী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা শহরে এখন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি মানুষ। এদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে উঠে আসা যেখানে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এই মর্মে সারা বিশ্বে প্রচারণা আছে। অন্য দিকে গ্রাম থেকে বা মফস্বল শহর থেকে আসছেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত। অধিক প্রতিষ্ঠা, ইজ্জত বা বিদেশ পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে। ঢাকার সঙ্গে ঢাকার বাইরের শহরগুলোর সুযোগ-সুবিধার তফাৎ এতই যে, ঢাকায় আসার যুক্তিটা সবার ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়।

উপসংহার

আমাদের অনুসন্ধানে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখছি যে, একদিকে পুরনো অনেক পেশা ভাঙছে অন্যদিকে নতুন অনেক পেশা গড়ে উঠছে। লক্ষ্যণীয় যে, নতুন পেশাগুলোর সঙ্গে দেশীয় উৎপাদনশীল ভিত্তির সম্পর্ক ক্ষীণ। দেশীয় তৎপরতায় যে পেশাগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো তুলনায় অনেক ভঙ্গুর। স্থায়ী পেশাগুলোর প্রকৃত আয় কমেছে কিন্তু বাড়তি আয়ের পথ খুলেছে অনেক। এক ব্যক্তির আয়ভিত্তিক পরিবার অনেক কমে এসেছে এবং অন্যদিকে আয়-উপার্জনমূলক কাজে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত দু'ক্ষেত্রের নারীরই অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে।

পেশাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। বাংলাদেশেও তা চলছে, চলবেও। তবে এর ধরন ও গতিমুখই হল গুরুত্পূর্ণ। বাংলাদেশে অর্থনীতির যে ধরন বর্তমানে চলছে তাতে পরিবর্তন আরও হলেও গতিমুখের আশু কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আমাদের গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা ঢাকা শহরে এর কেন্দ্রীয় চেহারাটাই দেখেছি, যেখানে গতি ও বৈপরীত্য একই সঙ্গে বাড়ছে।

টীকা ঃ এই গবেষণায় প্রবন্ধকারের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন : তাসলিমা আখতার, ফারজানা রহমান, হানিফ দেওয়ান, সোহেল আহমেদ, আবদুল আলী, ইফতেখার আহমেদ, ফিরোজ আহমেদ, শামীমা আখতার, জাহিদুন্নবী। প্রবন্ধকার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

তথ্য নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০০) *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

মুতি, আব্দুল্লাহ আল (১৯৯৬) *আমাদের শিক্ষা কোন পথে।* ঢাকা।

BANBEIS (1974) *Bangladesh Educational Statistis.* Dhaka : BANBEIS.

BANBEIS (1985) *Bangladesh Educational Sratistics.* Dhaka: BANBEIS.

BANBEIS (1991) *Bangladesh Educational Statirtics.* Dhaka : BANBEIS.

Task Forces (1991) *Report of the Task Forces on Development Strategies for the 1990s.* Dhaka : UPL.

UNDP (1999) *Human Development in South Africa.*

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম *

Transparency and Accountability in Administration: Bangladesh Context. Md. Zohurul Islam

Abstract : Transparency and accountability are two interrelated components of democracy. Without these components, democracy remains incomplete. In Bangladesh transparency and accountability are absent almost in all sectors, interruption in democratic process through military rule, illiteracy and lack of mass awareness are responsible for this. For national development, there is no alternative to transparency and accountability. Uninterrupted democratic process, rule of law, educated and conscious people can play a vital role to ensure transparency and accountability in Bangladesh. Our Constitution has provision for an Ombudsman and its appointment of Ombudsman can pave the way of transparency and accountability in our country.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান প্রশাসনের উপর ন্যস্ত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের দায়িত্ব পালনে প্রশাসনের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রশাসনকে তার জবাবদিহি করতে হয়। প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, সরকারী অর্থ সম্পদ অপচয়, জনগণের হয়রানী ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ আছে। পত্র-পত্রিকায় চোখ পড়লেই দেখা যায় প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল। অথচ সরকারী কর্মচারীর অন্যায় কাজ ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য আছে সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি, শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি,

* সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

আছে দুর্নীতি দমন আইন। নাই শুধু এ সব আইনের যথাযথ প্রয়োগ। তাই আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে, দুর্নীতি রোধে, জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে, কর্মচারী শৃঙ্খলা বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করণে, প্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিত করণে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। স্থিতিশীল সরকারের নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি আনা সম্ভব।

বর্তমান প্রবন্ধে যেসব বিষয় আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে সেগুলো হলঃ (ক) প্রশাসনে বর্তমানে কি ধরনের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আছে তার পর্যালোচনা; (খ) প্রশাসনে স্বচ্ছতার আদৌও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা পর্যালোচনা; (গ) প্রশাসনে বর্তমানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যে অভাব আছে তা চিহ্নিত করা; এবং (ঘ) প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুপরিশমালা। এ প্রবন্ধের সকল তথ্য মাধ্যমিক উৎস যেমন বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত এ সম্পর্কিত নিবন্ধ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, রুলস অব বিজনেস, সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি, এ সম্পর্কিত পেপার, জার্ণাল, জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, দি অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ইত্যাদি হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশাসন ও প্রশাসনে জবাবদিহিতা

প্রশাসনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাসন কাজ পরিচালনা করা। মূলতঃ তিনটি ধারায় দেশ পরিচালিত হয়। প্রথমতঃ আইন পরিষদ, দ্বিতীয়তঃ শাসন বিভাগ এবং তৃতীয়তঃ বিচার বিভাগ। আইন পরিষদে আইন প্রণীত হয়। শাসন বিভাগ আইনের বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ কোথায়ও কিছু ঘটলে তা নিষ্পত্তি করে। সাধারণ অর্থে প্রশাসন বলতে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের কার্যনির্বাহী বিভাগের কাজকে বুঝায়। সরকারী নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব কাজই হচ্ছে প্রশাসন। সরকার প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলেই সরকার হয়। প্রশাসনের কাজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার নীতি প্রণয়ন করে, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে, বিধি বিধান প্রণয়ন

করে এবং সে মোতাবেক দপ্তর, অধিদপ্তর ও কার্যালয় তা বাস্তবায়ন করে। প্রশাসন প্রধানতঃ আইন শৃঙ্খলাসহ সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করে, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ করে, যোগাযোগ, ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মকান্ডের যথাযথ প্রসারে উৎসাহ দেয় এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনকল্যাণ ও সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

প্রশাসন এবং জবাবদিহি দুটি আলাদ শব্দ। প্রশাসন হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকে। আর জবাবদিহিতার আভিধানিক অর্থ কৈফিয়ত। অর্থাৎ জবাবদিহি হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারিতে জবাবদিহিকে "A requirement to give explanations for one's actions" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রশাসনে জবাবদিহিতা বলতে প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করার সন্তোষজনক কৈফিয়ত প্রদান করা বুঝায়। জনগণকে নিয়েই সরকার। সরকারকে নিয়েই প্রশাসন। জনগণের অর্থে সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় বিধায় এখানে জবাবদিহি শুধু প্রতিষ্ঠানের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশ প্রশাসনে কোন কর্মচারী জবাবদিহিতায় ব্যর্থ হলে তাকে যে কোন প্রকার শাস্তি পেতে হয়। এ শাস্তি তিরস্কার হতে শুরু করে ফৌজদারী মামলার আসামী পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানের মুখবন্ধে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন সত্ত্বার সমৃদ্ধি লাভের অঙ্গীকারও ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। আবার সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের কথা বলা হয়েছে। সেখানে অধিকারের সাথে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও নারী-পুরুষে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল সময়ে জনগণের সেবা করা প্রজাতন্ত্রের নিযুক্ত সকলের কর্তব্য। কাজেই সংবিধানের মাধ্যমে দেশের জনগণ প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে পালন করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত

সকল ব্যক্তির কর্তব্য। সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দেশের যাবতীয় আইন ও বিধি-বিধানে যে ক্ষমতা প্রশাসনকে দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে জনস্বার্থে কার্যকর করা প্রশাসনের দায়িত্ব। এসব ক্ষমতা যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রশাসন জবাবদিহিতার দায়ে দায়বদ্ধ। চাকুরী ক্ষেত্রে কাজের জন্য একজন না একজনের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহির প্রথা না থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা আসে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অনন্য কৌশল জবাবদিহিতা। দক্ষ এবং উন্নত প্রশাসনের জন্য জবাবদিহিতার জুড়ি নেই। দক্ষতা আসলে উন্নয়ন আসে।

প্রশাসনে জবাবদিহিতার বর্তমান পদ্ধতি

সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম বিবিধ উপায় বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ উপায়গুলোকে প্রধানতঃ ৩ ভাগে ভাগ করা যায়- (ক) সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ; (খ) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও (গ) বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ।

সংসদীয় নিয়ন্ত্রণঃ মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী (সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৫৫)। এ জবাবদিহিতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি মোতাবেক বাস্তবায়িত হয়। সংসদ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও আর্থিক ও অন্যান্য জাতীয় জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিবিধ বিষয়ের জন্য অনেক স্থায়ী কমিটি গঠন করে। এসব স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনের জবাবদিহিতা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতে সদস্য নিয়ে সংসদ তিন ধরনের স্থায়ী কমিটি গঠন করে থাকে- (ক) সরকারী হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষ অধিকার কমিটি; (গ) সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে কোন মন্ত্রণালয়ের কাজ বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রশ্নাদির মৌখিক ও লিখিত জবাব লাভের ব্যবস্থা করতে পারে। বর্তমানে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আছে। এসব সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে জবাবদিহি করে। সংসদে প্রশ্নের জবাব হচ্ছে সংসদীয়

পদ্ধতির সরকারের বৈশিষ্ট্য। সংসদে প্রশ্নের জবাবদানের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনের জবাবদিহিতা হয়। সংসদ অধিবেশনের প্রথম ১ ঘন্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও জবাব দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সংসদে (ক) তারকা চিহ্নিত, (খ) তারকা বিহীন ও (গ) স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন করার বিধান আছে। তাছাড়া সংসদের মাধ্যমে জবাবদিহিতার অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে আছে- (ক) জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, (খ) জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ ও (গ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন।

প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণঃ প্রত্যেক কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জবাবদিহি করে থাকে। প্রশাসনে বিভিন্ন ধাপ আছে। এ ধাপগুলি প্রধানতঃ উর্ধ্বমূখী। বিভিন্ন ধাপের জবাবদিহিতা নিম্নবর্ণিতভাবে হয়ে থাকেঃ

ক) লিখিত রিপোর্ট/রিটার্ণ দাখিল;

খ) পরিদর্শন/ভিজিট;

গ) রুল্‌স অভ বিজনেস/সচিবালয় নির্দেশিকা;

ঘ) সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি; এবং

ঙ) অডিট।

অধঃস্তন কর্মকর্তা/কার্যালয়কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কার্যালয়ে সময় সময় রিপোর্ট/রিটার্ণ দাখিল করার বিধান আছে। এসব রিপোর্ট/রিটার্ণের মাধ্যমে অধঃস্তন অফিস/কর্মকর্তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ও সেবা প্রদানের বিষয়ে উর্ধ্বতন অফিস/কর্মকর্তা সম্পাদিত কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নিরূপণ করে বিধি-বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে পারে। এভাবে রিপোর্ট/রিটার্ণ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা পূর্বক অধঃস্তন কার্যালয়/কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করা হয়।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তন কর্মকর্তার কাজ সময় সময় পরিদর্শন/ভিজিট করার নিয়ম আছে। পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে করলে অধঃস্তন কর্মকর্তার দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সময়মত অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে বা সেবা প্রদান করতে অধঃস্তন কর্মকর্তা বাধ্য থাকে। কর্মকর্তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে

সম্পাদনের নিমিত্তে রুল্‌স অব বিজনেস এবং সচিবালয় নির্দেশিকা আছে। এসবের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা আছে। এসব বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা কার্যকর করা হয়।

সরকারী কর্মচারীদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে বর্ণনা সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিতে বর্ণিত আছে। এ আচরণ বিধি প্রণয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, দূর্নীতি, অনিয়মের বিষয়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা। আচরণ বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য সরকারী কর্মচারীকে শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

সরকারী কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও অফিস পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিবিধ আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে যে অর্থ ব্যয় করে থাকে তা যথাযথ ও বিধি-বিধান সম্মত হয়ে থাকে কিনা তার জন্য সরকারী কার্যালয় অডিটের নিয়ম আছে। সরকারী আর্থিক বিধি বহির্ভূত অন্যায়ভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কর্মকর্তা সরকারী অর্থ ব্যয় করলে অডিটের মাধ্যমে জবাবদিহির ব্যবস্থা আছে।

বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণঃ প্রশাসনের কোন কর্মকর্তার বেআইনী কোন আদেশ-নির্দেশ বা ক্ষমতার অপব্যবহার হলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রশাসন লংঘন করলে সে বিষয়ে জনগণ আদালতে মামলা করে প্রশাসনকে জবাবদিহি করে ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারে।

প্রশাসনে জবাবদিহিতার বর্তমান পদ্ধতির দুর্বলতা

প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে যে সংসদীয়, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধানের ব্যবস্থা আছে তা অনেকাংশেই দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। একটি উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রশাসন হয় স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দক্ষ। সেখানে সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সেজন্য সরকারকে হতে হয় সর্ব কাজে স্বচ্ছ। প্রশাসনের সাথে রাজনীতির

সম্পর্ক থাকে। উপরের পর্যায়ে থাকে রাজনীতিবিদ যারা দিক নির্দেশনা দেবেন এবং পরের পর্যায়ে আসে প্রশাসন, যারা সে দিক নির্দেশনা মতো কাজ করে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা প্রশাসনিক জবাবদিহিতার পূর্বশর্ত। আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সর্বস্তরে নিয়েছে- একথা বলা যাবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়েছে একথাও ঠিক নয়। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও দরিদ্র; ধনী-দরিদ্রের সম্পর্ক এখানে আধা-সামন্ততান্ত্রিক। এমতাবস্থায় জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব আছে। যে সরকারই যখন ক্ষমতায় থাকে তাদের প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

আমাদের দেশে সক্রিয়ভাবে দীর্ঘদিন যাবত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংসদ কখনো চলেনি। মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। এসব কারণে প্রশাসনে জবাবদিহিতা করতে সংসদ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তা ও ব্যবস্থাপনা সার্ভিস দপ্তরের লোক-প্রশাসন শাখা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা রিপোর্টে সুপারিশ করে যে, সংসদে মন্ত্রণালয় বিষয়ক পর্যালোচনা কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে মন্ত্রণালয়ের কাজ খতিয়ে দেখা ও রিপোর্ট করার ব্যাপারে তাদের কার্যকারিতা বাড়ে। সরকারের মন্ত্রী নন এমন একজন সংসদ সদস্য এসব পর্যালোচনা কমিটির সভাপতি হবেন। রিপোর্টে আরো সুপারিশ করা হয় যে, বিরোধী দলীয় সদস্যরা এসব কমিটির কোন কোনটির এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রধান হতে পারেন।

প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যে রিপোর্ট/রিটার্ণ পর্যালোচনার ব্যবস্থা আছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, এসব রিপোর্ট/রিটার্ণ সাধারণতঃ খতিয়ে দেখা হয় না এবং প্রায়শঃই রিপোর্ট/রিটার্ণের উপর কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে যে পরিমাণ ভ্রমণ ভাতা দেয়া হয় তা দিয়ে পরিদর্শনকালীন থাকা-খাওয়া ও আসা-যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই অধঃস্তন কর্মকর্তাকে অধিকাংশ সময়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার জন্য নাস্তা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফলো-আপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না বিধায় পরিদর্শন/ভিজিট কার্যকর হয় না।

সচিবালয় নির্দেশিকা মোতাবেক নথির নিষ্পত্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাস্তবে হয় না বললেই চলে। সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি বাস্তবে খুবই কম প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও এসোসিয়েশনের চাপ থাকে এবং তদবির কাজ করে। সরকারী কার্যালয়ে সাধারণতঃ খরচের বহু পরে অডিট হয়। অডিটের মাধ্যমে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টার চেয়ে দোষ ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের জবাবদিহিতা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের যথাযথ জবাবদিহিতা হয়না। কারণ প্রথমতঃ আদালতের মাধ্যমে শুধু অতি অল্প সংখ্যক বে-আইনী আদেশের সুরাহা হয়। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মাধ্যমে প্রশাসনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বে-আইনী আদেশের নিষ্পত্তি করতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগে। তৃতীয়তঃ এ ব্যবস্থা ব্যয় সাপেক্ষ।

আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রশাসনের জবাবদিহিতার জন্য যে সমস্ত নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি আছে তার দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান হয় না। এজন্যে বার বার প্রশাসনে সংস্কারের কথা উঠে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস প্রচন্ড অন্তর কলহে লিপ্ত। দূর্নীতি প্রশাসনের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের ব্যাপকতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই লেখালেখি হয়। কিন্তু রোগ নিরাময়ের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না।

জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের জন্য ন্যায়পালের প্রয়োজনীয়তা

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তার থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা বিদ্যমান। ফলে প্রশাসনে একদিকে যেমনি দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিরপেক্ষতার অভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হতাশা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান অপরদিকে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম, অদক্ষতা, তোষামোদ, কাজে দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের অভাব আছে। এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান কার্যকর করা হলে আশা করা যায় যে, অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। উন্নত গণতান্ত্রিক বহু দেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর থাকায় সেখানে

সচিবালয় নির্দেশিকা মোতাবেক নথির নিষ্পত্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাস্তবে হয় না বললেই চলে। সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি বাস্তবে খুবই কম প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও এসোসিয়েশনের চাপ থাকে এবং তদবির কাজ করে। সরকারী কার্যালয়ে সাধারণতঃ খরচের বহু পরে অডিট হয়। অডিটের মাধ্যমে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টার চেয়ে দোষ ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের জবাবদিহিতা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রশাসনের যথাযথ জবাবদিহিতা হয়না। কারণ প্রথমতঃ আদালতের মাধ্যমে শুধু অতি অল্প সংখ্যক বে-আইনী আদেশের সুরাহা হয়। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মাধ্যমে প্রশাসনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বে-আইনী আদেশের নিষ্পত্তি করতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগে। তৃতীয়তঃ এ ব্যবস্থা ব্যয় সাপেক্ষ।

আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রশাসনের জবাবদিহিতার জন্য যে সমস্ত নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি আছে তার দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান হয় না। এজন্যে বার বার প্রশাসনে সংস্কারের কথা উঠে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস প্রচন্ড অন্তর কলহে লিপ্ত। দূর্নীতি প্রশাসনের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের ব্যাপকতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই লেখালেখি হয়। কিন্তু রোগ নিরাময়ের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না।

জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের জন্য ন্যায়পালের প্রয়োজনীয়তা

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তার থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা বিদ্যমান। ফলে প্রশাসনে একদিকে যেমনি দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিরপেক্ষতার অভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হতাশা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান অপরদিকে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম, অদক্ষতা, তোষামোদ, কাজে দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের অভাব আছে। এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান কার্যকর করা হলে আশা করা যায় যে, অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। উন্নত গণতান্ত্রিক বহু দেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর থাকায় সেখানে

প্রশাসন শুধু গতিশীলই হয়নি বরং এ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশাসনের অনিয়ম কার্যকরভাবে দূরীভূত হয়েছে।

ন্যায়পালের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগাদির তদন্তকারী কর্মচারী (An official appointed to investigate complains against public authorities)। ন্যায়পাল একটি প্রতিষ্ঠান। এ দেশে সংবিধানে ন্যায়পালের ধারণার কথা উল্লেখ থাকলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকার (আওয়ামী লীগ) ক্ষমতায় আসার পর ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করলেও তা সংসদের প্রাচীর ও পত্রিকার মুদ্রণের মধ্যেই থেকে যায়।

১৮০৯ সাল থেকে সুইডেনে ন্যায়পালের প্রতিষ্ঠান চলে আসছে। এখন ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা, ভারতসহ উন্নত গণতান্ত্রিক বহু দেশে এ প্রতিষ্ঠান আছে। পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাধারণতঃ বিচারপতি বা প্রশাসনে অভিজ্ঞ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ন্যায়পাল মনোনয়ন করে থাকে। প্রশাসন যাতে দেশের আইন ও বিধি-বিধানের বাহিরে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করা ন্যায়পালের কাজ। ন্যায়পাল স্বাধীনভাবে কাজ করে। যে কোন সরকারী বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি পরিদর্শন ও প্রয়োজনে তদন্ত করা ন্যায়পালের কাজ। কোথাও কোন ব্যতয় ঘটলে তার আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানায়। সুইডেনের প্রধান পার্লামেন্টারী ন্যায়পাল সি একলুনদ এর ভাষায়- "Administrative errors do into happen simply because of the existence of the Ombudsman."

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ১৫ নম্বর আইন) পাশ হয়। এ আইন, যে তারিখ হতে সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কার্যকর করতে চাইবে, সে তারিখ হতে কার্যকর হবে। এ আইনে ন্যায়পালের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনের পদ্ধতির বিধানাবলী আছে। এ আইন মোতাবেক সংসদের সুপারিশে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। সততার জন্য সুখ্যাত, প্রশাসনে বা আইনে দক্ষ কোন ব্যক্তি ন্যায়পাল হতে পারবেন। ন্যায়পালের কার্যকাল হবে তিন বৎসর। তবে পুনরায় আর একবার তাঁকে নিয়োগ করা যাবে।

শারীরিক অকর্মণ্যতা বা অসদাচরণের জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে ন্যায়পালকে অপসারণ করা যাবে। আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির যে সুযোগ-সুবিধা ও বেতন থাকবে ন্যায়পালও তা ভোগ করবেন।

কোন ব্যক্তি যদি ন্যায়পালের নিকট এ মর্মে অভিযোগ করে যে, (১) কোন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা সরকারী কর্মচারী তার প্রতি কোন প্রকার অবিচার করেছে, অথবা (২) কোন ব্যক্তিকে অবৈধ সুযোগ দেয়া হয়েছে বা নিজে অবৈধ সুযোগ নিয়েছে অথবা এ ধরনের কোন অভিযোগের বিষয় অন্য যে কোনভাবে ন্যায়পাল জানতে পারলে সে বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। ন্যায়পাল কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ হাজির করতে বলতে পারবেন।

ন্যায়পাল তদন্ত করে যদি বুঝতে পারেন যে, কোন সরকারী কর্মচারীর অপকর্মের ফলে কোন ব্যক্তির প্রতি অবিচার করা হয়েছে তবে ন্যায়পাল ঐ সরকারী কর্মচারীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সে মর্মে রিপোর্ট দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুরাহা করতে বলবেন। এ রিপোর্টের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময় শেষ হবার ১ মাসের মধ্যে ন্যায়পালকে অবিহত করতে হবে।

কোন সরকারী কর্মকর্তা অন্যায় লাভের জন্য অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে অন্যায় সুবিধা দেয়ার জন্য যদি কোন কাজ করে এবং ন্যায়পাল তদন্তক্রমে সে মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তিনি ঐ সরকারী কর্মকর্তার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সে মর্মে প্রতিবেদন দিয়ে তার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা বা বিভাগীয় মামলা বা শৃঙ্খলা জনিত অপরাধের ব্যবস্থা নিতে বলতে পারবেন। এ প্রতিবেদন পাবার ১ মাসের মধ্যে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা ন্যায়পালকে জানাতে হবে।

ন্যায়পালের তদন্তের বিষয়ে প্রচুর ক্ষমতা থাকলেও তাঁর কোন নির্বাহী ক্ষমতা নেই। তাঁর মতামতের উপর কোন কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হয় না। এভাবে তাঁর কাজের ভারসাম্য বজায় থাকে।

আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ যথাযথভাবেই এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

(১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারবেন। সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। ন্যায়পাল তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হবে। ১৯৮০ সালে সরকার ন্যায়পালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংজ্ঞায়িত করে ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সালের ১৫নং আইন) প্রণয়ন করে। কিন্তু সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারী করে এখনও এ আইন কার্যকর করা হয়নি।

রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ-এর অস্থায়ী সরকারের আমলে ১৯৯১ সনে দেশের উন্নয়নের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ২৯টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। সরকারের অপকর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত (Government malpractice) টাস্ক ফোর্স প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যায়পালের পদ সৃজনের জন্য সুপারিশ করে- "Introduction of the Ombudsman system in Bangladesh with necessary modifications, will go a long way to help prevent abuse of power of the executive wing of the government... The Task Force recommends creation of the post of 'Naypal' with broad legal authority to perform his task."

১৯৯৩ সালে ইউএনডিপির বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা রিপোর্ট প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ন্যায়পাল নিয়োগের সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশে বলা হয়ঃ "(৫) সংবিধানের ৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত ন্যায়পালের (Ombudsman) বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। ন্যায়পালের ধারণার কথা সংবিধানে উল্লিখিত থাকলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের নালিশ শোনা ও বিচার বিবেচনা করার জন্য কিছুটা তৈরী পদ্ধতি থাকা জরুরী।"

১৯৯৩ সালে মন্ত্রি পরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমানসহ সরকারের অপর তিনজন সচিবের একটি দল যুক্তরাজ্যে- "Towards Better Government: Principles into Practice" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন ও পরে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে ১৯৯৩ সনে প্রধান মন্ত্রীর নিকট ৯৮ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাতে প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। প্রতিবেদনে সত্বর ন্যায়পাল আইন কার্যকর করার জন্য সুপারিশে বলা হয় (পৃষ্ঠা-৫৮)ঃ "4.49 Parliament has, in 1980 enacted a law (Act no 15 of 1980) providing for the office of Ombudsman. The Act provides for the appointment of a person with known legal or administrative ability and conspicuous integrity. The law will come into being as soon as a notification to that effect in issued by the Government. It is recommended that the decision on giving effect to the law be taken soon."

এমতাবস্থায় সংবিধানে ন্যায়পাল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-এর আলোকে এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহমেদের সময়ের টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ, ইউ এন ডি পি-এর লোক-প্রশাসন সমীক্ষা রিপোর্ট এবং চার সচিবের বাংলাদেশে সরকার সংক্রান্ত প্রতিবেদনের (Towards Better Government in Bangladesh) সুপারিশ মোতাবেক ১৯৮০ সাল ন্যায়পাল নিয়োগের যে আইন প্রণীত হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকর করা সুসরকার গঠনের জন্য অপরিহার্য।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা

আভিধানিক অর্থে যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ ঘটে তাই স্বচ্ছ। যেমন কাঁচ। কিন্তু প্রশাসন কাঁচ নয়। প্রশাসনের কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহের ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ হয় না। তাহলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা বলতে আমরা কি বুঝবো? প্রশাসনের ভিতর দিয়ে যা প্রতিসরণ করতে পারে তা হচ্ছে- "Various kinds of information for public observation perusal and guidance. Information about government decisions,

activities, plans, programmers, policies, etc., can be transmitted and furnished made visible and intelligible through various ways and means to the public"... প্রশাসন যখন কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে তখন সেই কাজটি প্রশাসন কিভাবে করছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণার অনুভূতিকে আমরা প্রশাসনের স্বচ্ছতা বলতে পারি।

সুতরাং প্রশাসন যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে, পরিকল্পনা, কর্মসূচি বা নীতি গ্রহণ করে, সে সব সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি বা নীতি কেন, কার জন্য এবং কি পদ্ধতিতে নেয়া হলো সে সব তথ্য যখন প্রশাসন জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে উন্মুক্ত করে অথবা সে সব তথ্য বা ভেতরের খবর যখন জনগণের কাছে প্রতিবন্ধহীন ভাবে লভ্য হয় তখন তাকে স্বচ্ছ প্রশাসন বলা যেতে পারে।

প্রশাসনে স্বচ্ছতার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশাসনে স্বচ্ছতা রাষ্ট্রের নাগরিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। শুধু তাই নয়, সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম প্যারাতে বলা হয়েছে, আমরা বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন করিয়াছি। সকল কিছুর উপরে জনগণ। সুতরাং যে জনগণের জন্য প্রশাসনের সকল কর্মোদ্যোগ, সেই জনগণের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন সকল নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম কেন হলো, কিভাবে হলো ও কার জন্য হলো- সে সব তথ্য জনগণের জানার জন্য উন্মুক্ত করার যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাকে প্রশাসনে স্বচ্ছতার ধারণা বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যদি জনগণ হয় আর জনগণের সেবা করা যদি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হয়, তাহলে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের শর্ত পূরণের জন্যই প্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রয়োজন। যে জনগণের হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা কাজ করছেন, সেটা ঠিক করছেন না বেঠিক

করছেন, ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে করছেন না সীমার মধ্যে আছেন, কাজটা নিজ স্বার্থে না গোষ্ঠী বা ব্যক্তি স্বার্থে করা হচ্ছে, তাতে জনগণের কল্যাণ বয়ে আনবে না অকল্যাণ হবে, এগুলো শুধু তখনই জনগণ বিচার-বিবেচনা করতে পারবেন যখন প্রশাসনের প্রতিটি কর্মকান্ডের খবরের পেছনের খবর জনগণ জানতে পারবেন।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। সরকারের কাজ কর্ম যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা হয়তো হবে, কিন্তু শেষ ফল হবে সরকারের উপর জনগণের আস্থার বৃদ্ধি। সরকারের স্থিতিশীলতা জনগণের আস্থার উপর নির্ভরশীল। স্থিতিশীল সরকার অর্থ হচ্ছে নীতির স্থিতাবস্থা যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থাবলী

ক) জাতীয় সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের বক্তব্য তুলে ধরার ব্যবস্থা;

খ) মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে সংসদের নিকট মন্ত্রীর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা;

গ) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে গঠিত ষ্টান্ডিং কমিটির নিকট মন্ত্রী/কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা;

ঘ) কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া পাবলিক ডকুমেন্ট বলে চিহ্নিত রেকর্ড প্রাপ্তির ব্যবস্থা;

ঙ) সংবাদপত্রে মত প্রকাশের ব্যবস্থা;

চ) বাজেট, সরকারী গেজেট, বিভিন্ন প্রকাশনা, অডিট, মূল্যায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা;

ছ) রুলস অব বিজনেসের মাধ্যমে প্রশাসন ও সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা কতটুকু কাম্য

প্রশাসনে স্বচ্ছতা কতটুকু থাকা উচিত ও অনুচিত সে সম্পর্কে যেমন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে তেমনি ধারণারও ঘাটতি ও অস্পষ্টতা আছে। অনেকের ধারণা, প্রশাসনকে স্বচ্ছ করতে হলে নথিতে লেখা নোটও গণমাধ্যমে প্রচারিত হতে

হবে। অনেকে মনে করেন, অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ১৯২৩ প্রশাসনে স্বচ্ছতার অন্তরায়। গোপন বলে প্রশাসনে কিছু থাকা উচিত নয়। কিন্তু নথিতে তো এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যেটা প্রকাশ পেলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে। সেটা কি প্রকাশ করা ঠিক হবে? আবার অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ১৯২৩ উঠিয়ে দিয়ে প্রতিরক্ষার সকল খবর স্বচ্ছতার নামে দেশী-বিদেশী সবার কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? তা হলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যে হুমকীর সম্মুখীন হবে। তাহলে স্বচ্ছতা কতটুকু থাকা উচিত? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে।

আসলে গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে যেগুলো গোপন রাখা উচিত সেগুলো প্রথমে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তারপর বাকী যেগুলো থাকবে, যেমন সংসদের বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত কমিটিসহ সকল কমিটির কার্যবিবরণী, উন্নয়ন সংক্রান্ত, নিয়োগ-পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত, অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠানসহ সকল রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি সংক্রান্ত ফাইল, যেগুলো জনগণের ট্যাক্সে পরিচালিত সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজ সংবাদ মাধ্যমের জন্য উন্মুক্ত করে লোক সম্মুখে তুলে ধরা যেতে পারে। অহেতুক প্রতি ফাইলে, প্রতিটি চিঠি-পত্রে টপ সিক্রেট, সিক্রেট, কনফেডিনসিয়াল ও রেষ্ট্রিকটেড সীল মেরে সেগুলোকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখার প্রয়াস সরকার ও প্রশাসনের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে মাত্র।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও সরকারী কর্মকর্তার সীমাবদ্ধতা

প্রশাসনে স্বচ্ছতা আন৩ে সরকারী কর্মকর্তার সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনার আগে কয়েকটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ যথাক্রমে নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগকে সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে প্রত্যেক অঙ্গের কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রশাসন যন্ত্র নির্বাহী বিভাগের অধীন। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসন পরিচালনার তত্ত্বাবধান করেন। এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণের কাছে তাদের কর্মসূচী পেশ করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তবেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা পান। এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন এটাই জনগণের কাছে দেওয়া তাদের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার তারা রক্ষা করছেন কি-না সেটা জনগণকে জানানো তাদের দায়িত্ব। কারণ তাদেরকে ক্ষমতায় থাকতে হলে বারবারই জনগণের কাছে যেতে হবে।

ক্ষমতাসীন দল জনগণের কাছে তাদের দেওয়া অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করে প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে। সুতরাং প্রশাসন কি করছে না করছে সে খবর জনগণের কাছে খোলামেলা করে দেওয়া ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় থাকার স্বার্থেই প্রয়োজন। জনগণ এসব খবর জানতে পারেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মারফত। রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্র যদি স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ করতে পারে, সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকে, সর্বোপরি, সংবাদ সূত্রগুলো যদি প্রশাসনিক আদেশ নির্দেশের খবরদারী মুক্ত হয়, তবেই জনগণ জানতে পারবে যাদেরকে তারা ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে তারা আদৌ ভোটারদের কাছে দেওয়া তাদের অঙ্গীকার রাখছে কি-না।

প্রশাসন যন্ত্রের ভেতরের পরিবেশ এবং প্রশাসনে যারা কাজ করেন তাদের মন-মানসিকতা স্বচ্ছতার পক্ষে-বিপক্ষে উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রশাসন যন্ত্রের ভেতরের পরিবেশ যদি সন্দেহ, অবিশ্বাস, হতাশা, তিক্ততা এবং বিদ্বেষপূর্ণ হয় এবং এর সাথে যদি দায়িত্বহীনতা, অযোগ্যতা এবং রাষ্ট্রীয়, বিভাগীয় আর্থিক ও আইনগত দূর্নীতির প্রসার ঘটে তখন সব কিছুকে আড়াল করার প্রবণতা বেড়ে যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অনেকগুলো সংসদীয় কমিটি কাজ করে। এ সব কমিটি নিয়মিত বৈঠকে বসে এবং এসব বৈঠকের আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ ও সিদ্ধান্ত জনগণের জানার জন্য সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করা যায়। মন্ত্রী পরিষদের নিয়মিত বৈঠক হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে এ ধরনের বিষয় ছাড়া অন্য সব ধরনের আলোচনার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত জনগণকে জানানো যেতে পারে। সংসদীয় কমিটিগুলো ও মন্ত্রী পরিষদ যখন এসব খবর জনগণকে জানাতে অনাগ্রহী হয় তখন তা প্রশাসন যন্ত্রকে তথা প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে এবং তাদের মধ্যে সব কিছুতে গোপনীয়তার দেয়াল সৃষ্টি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা এবং গণ সচেতনতা প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। দেশে শিক্ষিতের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকলে এবং সেই জনগোষ্ঠীর নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে রাষ্ট্রের

রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন জবাবদিহিতার জন্য বাধ্য হয় তেমনি প্রশাসনও গোপনীয়তার সীমা সংকুচিত করে আনে। এসব ছাড়াও রয়েছে সাংবিধানিক রক্ষা কবচের প্রশ্ন। জনগণের জানার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে যদি সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকে তাহলে প্রশাসনের জনগণকে জানানোর বাধ্য-বাধকতা থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যদি বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, এখানে একদিকে রয়েছে জনগণের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকারের অভাব, অন্যদিকে সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা লেখা থাকলেও রেডিও, টিভির মত সংবাদ মাধ্যমগুলো সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন, সংবাদপত্রের মাথার উপর ঝুলছে প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের মত নিবর্তনমূলক খড়গ। সরকারী বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রয়েছে সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। সংসদীয় কমিটিগুলো বৈঠক করে, মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক হয়। কিন্তু এসব বৈঠকের যে খবর জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রেসে দেওয়া তা এত স্বল্প যে সেটা পড়ার জন্যও কারো আগ্রহ জন্মায় না। এমনকি জনকল্যাণে গৃহিত সিদ্ধান্তগুলোও এমন গোপনীয়তার সাথে পাহারা দেওয়া হয় যে সেগুলো যুদ্ধ দলিলের মর্যাদা পায়। কোন গুরুতর ঘটনার উপর সরকার যদি প্রেস নোট দেয় মানুষ তা বিশ্বাসই করে না।

প্রশাসন যন্ত্রের ৬৩রের পরিবেশ বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রশাসনিক ক্যাডার ও প্রকৃচি-বিসিএস ২৬ ক্যাডার দ্বন্দ্ব এখন আর রাখ-ঢাকের পর্যায়ে নেই। কর্মকর্তার নিয়োগ-বদলী-পদোন্নতির মাপকাঠি সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। কর্মকর্তাদের মেধার মান নিয়ে এখন সভা-সেমিনারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ সার্ভিস সহ সার্বিকভাবে প্রশাসনের দূর্নীতি প্রবাদ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

জনগণের শিক্ষার হার ও সচেতনতা অত্যন্ত নিম্ন পর্যারে। দারিদ্র সব কিছুকে গ্রাস করেছে। সংবিধানে সংবাদ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা থাকলেও সরকার ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মৌলিক অধিকার হিসেবে

নাগরিকের জানার অধিকারের স্বীকৃতি নেই। এর উপর রয়েছে আইনগত বিধি-নিষেধ। রুলস অব বিজনেসের পঞ্চম অধ্যায়ের ২৬(১) ধারায় বলা হয়েছেঃ "No information acquired directly or indirectly from official documents or relating to official maters shall be communicated by a government servant to the press, to non-official or even officials belonging to other government offices, unless he has been generally or specially, empowered to do so."

সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধির ১৯ ধারায় বলা হয়েছেঃ "A government servant shall not, unless generally or specially empowered by the government in this behalf, disclose directly or indirectly to government servants belonging to other ministries, divisions or departments, or to non-official persons or to the press, the contents of any official document or communicate any information which has come intohis possession in the course of his official duties, or has been prepared or collect by him in the course of those duties, whether from official sources or otherwise". একই বিধির ৩২ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "Contravention of any of these rules shall be construed as misconduct within the meaning of the Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 and a Government servant found guilty of such contravention shall drender himself liable to disciplinery actionunder the aforsaid rules." সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ অনুযায়ী Misconduct এর জন্য একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তা censure থেকে শুরু করে বাধ্যতামূলক অবসরে যাওয়ার শাস্তি পেতে পারেন।

এমনিতেই বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়। উপরন্তু, রুলস অব বিজনেস ও সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধির উপরোক্ত ধারাগুলো সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে রীতিমত হুমকী দিচ্ছে

প্রশাসনে স্বচ্ছতার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য। কোন সৎ, বিবেকবান, নীতিবান ও দেশপ্রেমিক সরকারী কর্মকর্তা যদি দেশ ও জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রশাসনের লৌহ যবনিকা একটু ফাঁক করে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণকে কিছু দেখাতে চান তবে তাকে নিগৃহীত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েই তা করতে হবে। অন্যথায় নয়।

প্রশাসনে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার সম্পর্ক

প্রশাসনে জবাবদিহিতা আসে স্বচ্ছতার মাধ্যমে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা রাষ্ট্রের নাগরিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। সরকারের কর্মকান্ড, নীতি, পরিকল্পনা সবকিছু জানা যায় স্বচ্ছতা থেকে। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ বুঝতে পারে সরকারের তথা প্রশাসনের স্বরূপ-দুর্বলতা-ত্রুটি এবং ভালো দিক। সুতরাং রাষ্ট্রের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করে স্বচ্ছতা আর স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে জবাবদিহিতার বিষয়টি বেরিয়ে আসে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বয়স সিকি শতক পেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ জন্মসূত্রে তার প্রশাসন ব্যবস্থা লাভ করেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্বার্থে যে প্রশাসন ব্যবস্থা পত্তন হয়েছিল ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ তার উত্তরাধিকার। বৃটিশ শাসনামল থেকে বর্তমান সময়ের ব্যবধান অনেক। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা এবং জাতিগঠন, উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের যে আকাঙ্ক্ষা তার সঙ্গে প্রশাসন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার সীমাবদ্ধতা প্রশাসন যন্ত্রের আধিপত্য ও সুসংহত অবস্থানকে পরিবর্তন করতে পারেনি।

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাবে বাংলাদেশের প্রশাসন অন্যান্য অনুন্নত দেশের মত অপপ্রশাসনে (Mal-Administration) এ পরিণত হয়েছে। এ প্রশাসনের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য হলো (ক) দীর্ঘসূত্রিতা; (খ) কর্ম-বিমুখতা; (গ) ঘুষ-দূর্নীতি;

(ঘ) আইন মান্য না করে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করা; (ঙ) বিদ্বেষ; (চ) কাজকে নিজের দায়িত্ব মনে না করা; (ছ) পক্ষপাতিত্ব, স্বজন প্রীতি; (জ) দাম্ভিকতা; (ঝ) ক্ষমতার অপব্যবহার করা; (ঞ) অতিরিক্ত গোপনীয়তা; (ট) চাটুকারিতা; হস্তক্ষেপ করার মানসিকতা; (ড) নৈতিকতার অভাব; (ঢ) প্রভূত্ববাদী মনোভাব এবং (ণ) জনবিচ্ছিন্নতা।

অপপ্রশাসন কখনই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে, যোগ্যতার সাথে, দক্ষতার সাথে পালন করতে পারে না। নিজেদের স্বার্থে কাজ করে উন্নয়নের এজেন্ট হিসেবে এদের ব্যবহার করা কঠিন বিষয়। আর সে কারণে নীতি প্রণীত হয়, বাস্তবায়িত হয় কিন্তু ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা না থাকার জন্য বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নয়নকামী ও উন্নয়নের এজেন্ট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ধারণা গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসনের পূর্বশর্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পূর্ব কথা হলো ক্ষমতাসীন দলের সরকারকে সংসদের কাজে জবাবদিহি রাখা। জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠান। সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা সরকার প্রধান মনোনীত হয় এবং মন্ত্রী সভা তার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনা করে। সরকারের গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা, আইন, বিল যেমন সংসদে আলোচিত হয় তেমনি সকল কাজের গঠনমূলক সমালোচনাও হয়। জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যমে এ বিষয়গুলোকে জন সমক্ষে আনে, ফলশ্রুতিতে সরকারের সকল কাজ সুস্পষ্টভাবে জনগণ জানতে পারে। সরকার পার্লামেন্টে এভাবে জবাবদিহি করে।

সরকার প্রশাসন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে। সরকারের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রশাসন যন্ত্রের উপর। সে কারণে সরকার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে

প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ পার্লামেন্টের কাছে তথা জনগণের কাছে এবং সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করে থাকে।

উপসংহার ও সুপারিশ

একটা দেশের প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নির্ভর করে সে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা মূল্যবোধ ও পরিবেশ দ্বারা। আর রাজনৈতিক পরিবেশ এবং প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সফলভাবে প্রয়োগ করার সামর্থ্য নির্ভর করে সে দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পরিবেশের উপর। স্থায়ী জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ।

২. প্রশাসন ও রাজনীতি পরস্পরের পরিপূরক। রাজনৈতিক ব্যর্থতা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পিছিয়ে দেয়। তাই রাজনীতিবিদ ও আমলা শ্রেণীর মধ্যে বিরোধিতা নিরসনের পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়-প্রতিযোগী নয় বরং অংশীদারিত্বে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে পরিবেশ গঠন করতে হবে। মন্ত্রী ও সচিবদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুস্পষ্ট হবে। বর্তমানে সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম (ক) সংসদের মাধ্যমে (খ) প্রশাসনের মাধ্যমে এবং (গ) বিচার বিভাগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রচলিত এই ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর। তাই রাজনৈতিক জবাবদিহিতা অর্জন করা দরকার।

৩. আমলাতন্ত্র বা আমলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রচলিত আইন ও বিধি, যেমন-সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন।

৪. ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠাঃ সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিধান থাকলেও আজও সে পদ সৃষ্টি হয়নি যদিও বিভিন্ন সময়ে সুপারিশ

করা হয়েছে। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্কের রীতি অনুসরণে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করতে পারলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন সম্ভব হবে। সে জন্য অনতিবিলম্বে ১৯৮০ সালের ন্যায়পাল আইন কার্যকর করা দরকার। তা ছাড়া বিচারক নিয়োগ নিরপেক্ষ করতে হবে।

৫. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণঃ বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়ন প্রশাসনের মৌল কৌশল। বর্তমান যুগে প্রতিটি উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশ বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন, যেখানে রাজনীতিবিদ, আমলা ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে, তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

৬. প্রশাসনিক সংস্কারঃ বর্তমানে প্রচলিত মাথাভারী প্রশাসন ব্যবস্থা সংকুচিত করতে হবে। দেশে গতিশীল, দক্ষ, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, সৎ, নিরপেক্ষ প্রশাসনের জন্য বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তার প্রয়োজন নেই। এ লক্ষ্যে অদক্ষ, দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছাঁটাই করা যেতে পারে। ছাঁটাইকৃত জনবলকে ভিন্নতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়মূলক কর্মকান্ডে নিয়োগ করে বা আত্মীকরণের মাধ্যমে প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। নুতন নিয়োগ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা যেতে পারে। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ১৯৭৯ সালে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে সুফল লাভে সমর্থ হয়েছে।

৭. প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি, পদায়ন, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি মেধা, দক্ষতা ইত্যাদিকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।

৮. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। এজন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেলে জবাবদিহিতাবোধ আসতে পারে।

৯. গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণঃ বিগত অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সামরিক শাসনের ফলে দেশে সামরিক আমলাতান্ত্রিক জোটের শাসন বিস্তার লাভ করে। এতে জন প্রতিনিধিদের সার্বিক কর্তৃত্বে কাজ করে যাবার মানসিকতা আমলাদের গড়ে উঠেনি। গণতন্ত্রকে লালন ও চর্চার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

১০. দূর্নীতি দমন ব্যুরোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা প্রয়োজন।

১১. প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করতে হবে এবং কার্যকরী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১২. প্রশাসনের জন্য বাস্তবভিত্তিক, যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা দরকার। এটি করা সম্ভব হলে সততা অর্জন সম্ভব হবে আর সে সঙ্গে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৩. শিক্ষা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। জানার অধিকারকে (Right to know) সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

১৪. তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থার মুক্ত প্রসারণ স্বচ্ছতা আনতে পারে। এজন্য গণ-মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

১৫. মহিলা সাংসদকে সরাসরি নির্বাচন করা এবং সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ বর্জন করতে হবে।

দূর্নীতি, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থ-চরিতার্থ করণের উলঙ্গ পাঁয়তারা সমগ্র জাতিকে হতাশা আর অন্ধকারের অতল আবর্তে নিক্ষেপ করছে। জাতির উন্নয়ন কর্মকান্ডে চরম নৈরাজ্য ও বন্ধ্যাত্ব নেমে এসেছে। সততার দূর্ভিক্ষ বর্তমানে ভয়াবহ রূপে জাতির জীবনে বিদ্যমান। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বলে শাশ্বত বাণীটির খেলাপ ঘটছে প্রতিনিয়ত। সত্য ও সততার নির্বাসন ঘটেছে। প্রশাসনে শাসন আছে তবে নেই কর্তব্যবোধ। জবাবদিহিতার পাট উঠে গেছে ধীরে ধীরে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা আনতে পারলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, ফলশ্রুতিতে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা আসবে যা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে তরান্বিত করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

আল-ফারুক, এম এম (১৯৯৭) *সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ৮৫ এবং আচরণ বিধি ৭৯ এর বিশ্লেষণ,* ৪র্থ সংস্করণ। ঢাকা।

উল্লাহ, মাহবুব (১৯৯৪) *বাংলাদেশে প্রশাসনের জবাবদিহিতাঃ কতিপয় প্রসঙ্গ।*

১৪ই জুলাই, ১৯৯৪ তারিখে বিসিএস প্রশাসন একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশের উন্নয়নে লোক-প্রশাসনের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে পাঠিত প্রবন্ধ।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (১৯৯৩) *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা রিপোর্ট*। ঢাকাঃ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী।

জামিল, কঙ্কা (১৯৯৫) *আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিঃ উন্নত ও উন্নয়নগামী কতিপয় দেশের অভিজ্ঞতা*। লোক-প্রশাসন সাময়িকী, ৪র্থ সংখ্যা-ডিসেম্বর-১৯৯৫। ঢাকাঃ বিপিএটিসি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (১৯৯২) *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী-বিধি*। ঢাকা ঃ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১৯৯২) প্রশাসনে স্বচ্ছতা শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী। ঢাকাঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮) *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*। ঢাকাঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

Ahmed, Ali (1981) *Basic Principles and Practices of Administrative Organization.* Dhaka: NILG.

Ahmed, Ali (1993) *Ombudsman for Bangladesh.* Dhaka: Academic Publishers.

Ahsan, Ekramul and Syed Naquib Muslim (January 16-20, 1994). *Accountability in Civil Service : The Bangladesh Context.* Dhaka: BPATC.

Day, Patrica and Kleir Rudolf (1987) *Accountabilities.* London: Tavistick Publications.

Gellhorn, Walter (1966) *Ombudsman and others : Citizens Protectors in Nine Countries.* Cambridge : Harvard University Press.

GOB. (1996) *Rules of Business.* Dhaka : Cabinet Division.

Islam, Saiful A.F.M. (1995) *Accountability and Transparency in Administration.* Handout. 23rd ACAD, BPATC.

Rahman, Ayebur M., et al. (1993) *Towards Better Government in Bangladesh.* Dhaka : Bangladesh Government.

Stacey, Frank (1978) *Ombudsma Compared.* Oxford: Clarendon Press.

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

বাংলাদেশে বনোজাড় ও তার পরিবেশগত প্রভাব

ডাঃ ইসরাত হাফিজ *

Deforestation and its impact on environment in Bangladesh.

Dr. Israt Hafiz *

Abstract. Forests have played a crucial role in the economic and social development of mankind. They provide food, fuel, furniture and materials for shelter and they also play a vital role in protecting and maintaining the stability of the natural environment. In Bangladesh the Forest ecosystem is deteriorating rapidly. Existing resources are heavily overexploited. Forest and woody vegetation's are being destroyed indiscriminately. As the country has been suffering from cronic food shortage which compile us to import 2 million tons of food grains every year. Moreover long time effects includes loss of boomers as well as of plant and animal species, greenhouse effects, savanization, soil erosion etc. So, it is high time to combat against the vanishing forest.

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, আমাদের অস্তিত্বসহ সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় পরিবেশ হচ্ছে "The sums total of all conditions and influences that affect the development and life of organisms" । ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পানি, বায়ু, ভূমি ও ভৌত সম্পদ এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবিত প্রাণীর সাথে এদের আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং পরিবেশ হচ্ছে সকল সামাজিক, ভৌত, জৈবিক এবং পরিবেশগত উপকরণের যোগফল।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক এবং মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে যেমন- ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিল্প দূষণ, রুগ্ন স্বাস্থ্য, বনোজাড়, মরুকরণ, জলবায়ুর পরিবর্তন, লবণাক্ততা, বৃক্ষ ও প্রাণীকূলের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করা

* প্রশিক্ষণার্থী, পঞ্চবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, বিপিএটিসি এবং সহকারী প্রধান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইত্যাদি। জনসংখ্যা, পরিমিত বনসম্পদের অবস্থা এবং দূষণমাত্রা- এই তিনটি চলকের উপর নির্ভর করে নিউজ উইক পত্রিকা বিশ্বের ৩০টি দেশ চিহ্নিত করে যাদের পরিবেশগত অবস্থা সবচেয়ে খারাপ অথবা ভাল। তন্মধ্যে বাংলাদেশের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে অরক্ষিত বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে রিপোর্টটি কোষ্টারিকা, ফ্রান্স, ইসরাইল এ তিনটি দেশের পরিবেশগত অবস্থাকে সবচেয়ে ভাল বলে চিহ্নিত করে।

টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) ধারণা আসার সাথে সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, নগরায়ন ও বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের ফলে বিশ্ব পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন। অপরিণামদর্শী বনোজাড়ের ফলে বিশ্বের আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে দারুণভাবে। তাই পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বনায়নের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে বনোজাড়ের স্বরূপ নির্ধারণ এবং প্রকৃতিতে এর আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রমের সফলতা এবং ব্যর্থতার দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও পরিবেশ

ক্ষুধা, দারিদ্র, সম্পদের অপ্রতুলতা, ঘনবসতি, দুর্নীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশ। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এই বিপন্ন পরিবেশ রক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশ ব্যতীত আমরা টেকসই উন্নয়ন অর্থাৎ Sustainable Development-এর দিকে এগিয়ে যেতে পারিনা। বিপন্ন পরিবেশের প্রভাব ইতোমধ্যেই আমাদের উপর পড়তে শুরু করেছে। সুতরাং পরিবেশ বিনষ্টের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের সময় এখনই। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রাক্কালে আমাদের বনজ সম্পদ ও তার সংরক্ষণ প্রতিটি নাগরিকের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার। তম্মধ্যে বনাঞ্চল ২১,৪৩৩ বর্গ কিলোমটিার যা মোট আয়তনের শতকরা ১৫ ভাগ। সারাদেশে এই বনাঞ্চলের বন্টন সুষম নয়। বেশিরভাগ বনাঞ্চলই দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। অল্প কিছু বনাঞ্চল মধ্য ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তবে ecological ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে কোন দেশে শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে তা ন্যূনতম চাহিদার অনেক কম। তদুপরি ৬৪ জেলার মধ্যে ২৮টি জেলায় কোন বনাঞ্চল নেই। কেবলমাত্র ৬টি জেলায় ecological ভারসাম্য রক্ষার করার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমি আছে। সেগুলো হলোঃ খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাঙামাটি। দেশের জনসংখ্যার বিস্তরণ অনুসারেও বনাঞ্চলের বন্টন খুবই অসম (সারণী ১)।

সারণী ১। জনসংখ্যা ও বনাঞ্চলের বন্টন

এলাকা (বিভাগ)	জনসংখ্যা (%)	বনাঞ্চলের পরিমাণ (%)
১। রাজশাহী	২৪	২
২। ঢাকা	৩০	৭
৩। খুলনা	২০	৪২
৪। চিটাগাং	২৬	৪৯
মোট	১০০	১০০

বনাঞ্চলের শ্রেণী বিন্যাস (প্রকৃতি অনুসারে)

প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সমতল ভূমির শালবন ও গ্রামীণ বন।

ক) পাহাড়ী বনঃ এ জাতীয় বন পার্বত্য জেলাসমূহ (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন), চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলাসহ দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। পাহাড়ী বনভূমির মোট আয়তনের ৭০ শতাংশ মাত্র বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং এরও বেশ কিছুটা নিম্নমানের। কৃত্রিম পুনর্জন্ম অনুসরণের মাধ্যমে 'ক্লিয়ার ফেলিং' প্রক্রিয়ায় এই প্রজাতির বন ব্যবস্থাপিত হয়।

অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি পাবর্ত্য জেলাগুলোতে অবস্থিত। স্মরণাতীতকাল থেকে অনিয়ন্ত্রিত জুমচাষের ফলে এতদাঞ্চলের বণভূমি সম্পূর্ণ বৃক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে। ভূমিক্ষয়ের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্রভাবে। যার ফলে সম্পূর্ণ এলাকাটি পরিণত হয়েছে একটি অনুৎপাদনশীল ভূমিতে। ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে এলাকার নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে; প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বনসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এবং দেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উৎস কাপ্তাই হ্রদের আয়ুস্কাল সীমিত হয়ে আসছে। এ জাতীয় বনাঞ্চলের প্রধান জাতসমূহ গরান, চাপালিশ, সিভিট, চম্পা, তেলসুর, গামার, তুন, ঢেকিজাম, কড়ই, টিক, প্রভৃতি।

খ) প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনঃ বৃহত্তর খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন আর্থিক দিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অরণ্য। এ বনাঞ্চলের প্রধান জাতসমূহ সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বিন, গরান, পশুর, গোলপাতা প্রভৃতি। ম্যানগ্রোভ বনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু চকোরিয়া সুন্দরবন বা উপকূলীয় বনাঞ্চল। বিগত ২৫ বছরে এর ৪৩ শতাংশ বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অতিরিক্ত বনাহরণ, চিংড়ি চাষ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অন্যান্য নানা কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জোয়ারের স্তর হ্রাস, ঘন ঘন প্লাবন ইত্যাদি এ বনোজাড়ের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। উপকূলীয় অঞ্চলে বনোজাড়ের কারণে ঝড় জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ অঞ্চলে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে তা কমিয়ে আনা সম্ভব। উল্লেখ্য বর্তমানে সরকারিভাবে উপকূলীয় বনাঞ্চলের বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে।

গ) সমতল ভূমির শালবনঃ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর জেলায় এ বনভূমি অবস্থিত। এ বনাঞ্চলের প্রধান জাতসমূহ হচ্ছে শাল, কড়ই, হলদা, ভাদী, বহেড়া,আমলকী প্রভৃতি। এ এলাকার বনভূমির মাত্র ৩২ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত। এ বনের ৯৫ হাজার ৫শত ৫৬ একর এলাকা বেদখল হয়ে গেছে। এ অবস্থা নিরসনে সরকার ১৯৭২ সালে সকল প্রকার সরকারি বনভূমি থেকে বনোৎসাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। স্থানীয় ক্ষমতাশালী ও লোভী লোকের হাতে এর পরেও চলেছে বনের নিধনযজ্ঞ।

ঘ) গ্রামীণ বনঃ সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, ফলের গাছ ও বাঁশ প্রভৃতি নিয়ে গ্রামীণ বন। কুটির শিল্প ও ছোট ছোট কাঠভিত্তিক শিল্পে কাঁচা মালের যোগান দিতে গিয়ে গ্রামীণ বন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশ সবুজ ঘেরা হলেও অর্ধেক এলাকায়ই কোন বনাঞ্চল নেই। তাই দেশে বনসম্পদের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অবশ্য চলতি অবস্থা বিরাজ করলে বর্তমান প্রজন্মও এ হুমকীর বাইরে নয়।

বনোজাড়ের কারণ

পৃথিবীর সবচেয়ে জন অধ্যুষিত দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং পরবর্তীতে বনের এই নিধনযজ্ঞ, বিশেষত গ্রামীণ বনোজাড় বেড়ে চলে আরো দ্রুতগতিতে। বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের প্রকৃতি ও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। এই ভয়াবহ বনোজাড়ের কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা;

খ) দারিদ্র্য;

গ) ভূমিহীন জনসাধারণের বনাঞ্চলে আবাসন;

ঘ) পরিবর্তিত চাষাবাদ ও জুমচাষ (পার্বত্য জেলাসমূহে);

ঙ) পশুখাদ্য (Grazing) ও আগুন;

চ) বনজসম্পদের চুরি ও অননুমোদিত নিধনযজ্ঞ;

ছ) জ্বালানী সংগ্রহ;

জ) অনিয়ন্ত্রিত ও ধ্বংসাত্মক নগরায়ণ প্রক্রিয়া;

ঝ) রাস্তাঘাট, বাঁধ, মিল-কারখানা, খনিজ উত্তোলন কর্মসূচি;

ঞ) হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশাল বনাঞ্চলের ধ্বংসসাধন;

ট) রিফিউজিদের পুনর্বাসন।

বনোজাড় নানাভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিপন্ন করে। বনোজাড়ের অসংখ্য কারণের মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ ও প্রকৃতিতে এর প্রভাব বর্ণনা করা হলোঃ

জুমচাষ ঃ অনিয়ন্ত্রিত জুমচাষের ফলে পাহাড়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি সম্পূর্ণ বৃক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে; ভূমিক্ষয়ের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্রভাবে। বর্তমানে তের ধরনের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তা এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ রত। প্রায় ৬০,৪০০ পরিবারসহ ৩৫০,০০০ জনসংখ্যা এই চাষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। একইভাবে শালবনসহ সমতল ভূমির বনাঞ্চল কেটে চাষাবাদ করা হচ্ছে। বর্তমানে সমতল এলাকার শালবনের মাত্র ৩০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের মাত্র ৬১ শতাংশ এলাকা উৎপাদনশীল বনভূমি হিসেবে বিবেচিত; বাকী এলাকা ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম বা তৃণ আচ্ছাদিত অথবা সম্পূর্ণ বিরানভূমি। প্রকৃতি ও অবস্থান ভেদে বনভূমির বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ। বৃক্ষাচ্ছাদিত বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতি দুর্যোগ প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পললায়ন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশংকাজনকভাবে।

জ্বালানীঃ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জ্বালানীর ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন আসলেও তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে

বনজ সম্পদের ব্যবহারই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও নানা খনিজ পদার্থ ও জ্বালানী শক্তির আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও এখনও বনজ জ্বালানীই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জ্বালানীর প্রধানতম উৎস।

পশুখাদ্য (Grazing) এবং আগুনঃ গবাদি পশু ও অন্যান্য বন্য পশু খাবার যোগান দিতে গিয়ে বনাঞ্চলে গাছের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছে। বিশেষ করে শুকনো এলাকায় ফরেস্ট গ্রেজিং অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। বনোজাড়ের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কারণগুল্মের মধ্যে রয়েছে আগুন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা হয়ে থাকে মানুষের কারণেই। যেমন পরিবর্তিত চাষাবাদের জন্য জমি পরিস্কার করার জন্য আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।

বনসম্পদের পরিবেশ গুরুত্ব

প্রতিবেশগত প্রভাবঃ বনসম্পদ জীবন প্রতিপালন পদ্ধতির (Life support System) একটি অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় অংশ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে বনসম্পদের নান্দনিক দিকগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেমন বনভূমি প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যা, খরা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ও বায়ুশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তৃত সবুজ-চত্বর (বনভূমি) শুধূ ঐ এলাকায় বায়ুকেই প্রভাবিত করে তা নয়, বরং বায়ুর গতি ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও ঘনীভবনের মাধ্যমে বায়ুতে অবস্থিত দূষিত পদাথের পরিবহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাত, কুঁয়াশা ও তুষারপাত ইত্যাদি মাধ্যমে বায়ু শোধনে সহায়তা করে। পরিমিত বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে ঘনবসতি এলাকার পরিবেশ প্রতিবেশ এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা নিরসন করা যায়।

গ্রীন হাউস প্রভাবঃ গ্রীন হাউস প্রভাব পরিবেশ সচেতনদের কাছে অতি পরিচিত। বহুল আলোচিত "গ্রীন হাউস প্রভাব" প্রশমিতকরণে বনের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রীন হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্যাসের ৪৯শতাংশ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO^2)। শুধু বিশ্বের বনাঞ্চল সংরক্ষণ বা অধিকতর বনায়নের মাধ্যমে পৃথিবীকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাবে না সত্যি কিন্তু যেহেতু বনায়নের

মাধ্যমে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া O^2 তৈরী করে তাই এর প্রতিক্রিয়া উপশম করা সম্ভব। পৃথিবীকে গ্রীন-হাউস প্রভাব থেকে বাঁচাবার অন্যতম তিনটি পদক্ষেপ হচ্ছে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, অধিকতর বনায়ন ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন।

গাছপালা ও বনাঞ্চল পশুপাখি এবং জীবজন্তুর স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল। গাছপালা ও বনাঞ্চল উজাড়ের ফলে পশুপাখি ও জীবজন্তুর খাদ্যচক্র ভেঙ্গে পড়ছে ও স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল কমে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেক প্রজাতি এবং জৈব বৈচিত্র ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে জৈব পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাললায়ন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশংকাজনকভাবে। তুলনামলক উচ্চভূমিতে অবস্থিত হলেও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো প্রায়শই ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে ভয়াবহ মরুকরণ প্রক্রিয়া।

বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় মাটির ক্ষয়রোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং মরুময়তা দেখা যায়। একই সাথে ক্ষয়রোধক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় উপ সয়েল অর্থাৎ হিউমাস কমে যায়। ফলে মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়, উদ্ভিজ্জহীনতা বৃদ্ধি পায় এবং দিবা-রাত্রির তাপমাত্রার তারতম্য বৃদ্ধিসহ আবহাওয়ার চরমভাবাপন্ন প্রবণতা বেড়ে যায়।

বন পরিস্থিতি এবং তার আর্থ-পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব

বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের প্রকৃতি ও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। গহীন অরণ্যাঞ্চল বলে আফ্রিকা মহাদেশের যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল আজ তা' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দেখা দিচ্ছে প্রচন্ড জ্বালানী সংকট, বিস্তৃতি ঘটছে সাহারার; খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। বনোজাড়ের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে দু'হাজার সাল নাগাদ ফিলিপাইনস-এ আর কোন বনভূমি থাকবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে জন অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশ। বনোজাড়ের ফলে দেখা দিয়েছে খাদ্য স্বল্পতা। বনজ জ্বালানীর অভাবে কৃষিজ দ্রব্যাদি ও পশুর গোবর ব্যবহৃত হচ্ছে জ্বালানী হিসেবে। তাই প্রাকৃতিক সারের অভাবে কৃষির উৎপাদন দিনে দিনে কমে আসছে এবং ব্যবহার বাড়ছে কৃত্রিম সারের যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। বনজ সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বনজ সম্পদের ব্যবহার সংকোচন করতে হচ্ছে। কাগজ কলগুলোতে কাঁচামাল সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কমতে থাকার ফলে দেখা দিচ্ছে কাগজ সংকট।

বনজ সম্পদের স্বল্পতার কারণে স্থানীয় উপজাতীয়রা তাদের ধর্ম পরিচালনা ও তাদের সনাতনী অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। বনবৃক্ষ তথা বনায়নের আরো একটি বিশেষ পরিবেশ গুরুত্ব হচ্ছে তার নান্দনিক অবদান। পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, পরিবেশকে বৈচিত্রময় করে তোলা, বিষন্ন মনের সজীবতা ফিরিয়ে আনা, জটিল সমাজ-সংসারে মানুষের মনকে প্রফুল্ল ও উদারচিত্ত করে তুলতে পারে এই বনভূমি। সুতরাং সামাজিক জীবনেও বনোজাড়ের প্রভাব পড়ছে ব্যাপকভাবে।

বনসম্পদ সংরক্ষণ ও বনায়ন

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশের বর্তমান আর্থপরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে দ্রুত ও ব্যাপক বনায়ন অতীব জরুরী এবং বনায়ন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, সংগঠন বা সরকারি উদ্যোগ- যেভাবেই বনায়নের পদক্ষেপ নেয়া হোক না কেন, তাতে সামাজিক বনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিৎ। চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের পুনর্বিন্যাস, সমন্বয় ইত্যাদি পদক্ষেপের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়ও এসব বিষয়সহ বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই উন্নয়ন ধারণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রণীত পরিবেশ নীতিতে বনায়ন ও বন সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

i) Conserve, develop and augment forest with a view to sustain the ecological balance and meet the socio-economic needs and prevailing realities.
ii) Include tree plantation programme in all relevant development schemes.
iii) Stop shrinkage and depletion of forest land and forest resources, and
iv) Develop and encourage use of substitutes of forest products.

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিও ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তায় বন সংরক্ষণ ও বনোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বনায়নের জন্য পরিকল্পনাগুলোতে জোর দেয়া হলেও বাস্তবে তা ফলপ্রসু হচ্ছে না। এর কারণসমূহ তলিয়ে দেখলে পাওয়া যায়ঃ

ক) জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি।

খ) প্রজাতি-স্থানের যথোপযুক্ততা সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা এবং সঙ্গত প্রজাতির মিশ্রণ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

গ) বন-আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি প্রবিধি সংক্রান্ত অজ্ঞতা এবং অপরিকল্পিত ও অননুমোদিত বনোৎসাদন প্রক্রিয়া।

ঘ) দূর্নীতি পরায়ণতা, দায়িত্বহীনতা, লোভী ও অসাধূ ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগসাজস রক্ষা করার কারণে বনায়ন না হয়ে বরং বনোজাড়ের প্রক্রিয়া হয়েছে ত্বরান্বিত।

তবে বনসম্পদ উন্নয়ন ও অধিকতর বনায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান ভূমিস্বল্পতা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার দিকগুলো চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে। একারণেই বনায়নের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনায় গ্রামীণ বনায়ন, চাষজ বনায়ন, কৃষি বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন, উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী, ও Strip

plantations ইত্যাদির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিক নার্সারি পরিচালনায় ঋণ প্রদান, সংরক্ষিত মূল বনাঞ্চলের চারপাশে বনায়নের মাধ্যমে বাফার অঞ্চল সৃষ্টি, উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রীনবেল্ট, বহুমাত্রিক ব্যবহারযোগ্য প্রজাতির বনায়ন ইত্যাদিও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বাস্তব দিক নির্দেশনা। এছাড়া এডিবির আর্থিক সহায়তায় গৃহীত ফরেষ্ট্রি মাষ্টার প্লান ১৯৯৪ সালে একটি নতুন বননীতি প্রস্তুত করে। এই মাষ্টার প্লানের উদ্দেশ্য হলো মোট এলাকার বনাঞ্চল ৬%-৮% হতে ২০% এ উন্নীতকরণ।

সামাজিক বনায়ন

বনসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সবচেয়ে যুগোপযোগী পদ্ধতি হলো সামাজিক বনায়ন। এতে স্থানীয় জনগণ বনোজাড়কে প্রতিরোধ করে এবং একই সাথে বনোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কর্মসূচী হাতে নেয়। সামাজিক বনায়নের সার্থক উদাহরণ হলো 'বেতাগী সোস্যাল ফরেষ্ট্রি প্রজেক্ট' যা ছিল 'স্বনির্ভর' বাংলাদেশের একটি কর্মসূচী। এর সফলতার মূল কারণ অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন পদ্ধতিসমূহ যেমন- ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক (জরিপ পরিমাণ <৩২ শতাংশ); ভূমির উপর নির্ভরশীলতা; এবং যারা অন্য কোথাও শ্রম বিক্রয় করবে না।

এনজিও-র ভূমিকা

বেসরকারী পর্যায়ে বনায়নের ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত বনায়নকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে এনজিওদের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। এডাব, ব্র্যাক, প্রশিকা, পৌষ, আরডিআরএস, স্বনির্ভর, ডিইউপি, কারিতাস ইত্যাদি এনজিওসহ ১০০টির বেশি এনজিও সামাজিক বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া BCAS (Bangladesh Centre for Advanced Studies), Centre for Sustainable Development (CFSD) সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 'নির্মল পরিবেশের জন্য আমরা' নারীপক্ষ জনগণকে সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মত কঠিন দায়িত্বটুকু পালন করবে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে পরিবেশের সাথে সমন্বিত করে জীবনমান উন্নয়নে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ স্থির করা হয়েছেঃ

ক) দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাধিতকরণ;

খ) অংশগ্রহণমূলক এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিবেশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ (সমতা তথা লিঙ্গ বিষয়টি বিবেচনা করে দরিদ্রদের সম্পদে প্রবিশাধিকার);

গ) পরিবেশ সংরক্ষণে দরিদ্রদের বিশেষ করে মহিলাদের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিবেশ-বান্ধব কার্যক্রম জোরদার;

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ঘটানো;

চ) পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণ ও ব্যক্তিখাতের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ;

ছ) মাটি, পানি ও বায়ু সম্পর্কিত পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ;

জ) পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং

ঝ) অনবায়নযোগ্য সম্পদের সংরক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি অব্যাহতকরণ।

বাংলাদেশের জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কর্ম পরিকল্পনা পরিবেশ উন্নয়নে একটি নীতি কাঠামো প্রণয়ন করেছে যার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন;

খ) দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা;

গ) পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয়কারী সকল প্রকার কার্যক্রম চিহ্নিত করণ এবং নিয়ন্ত্রণ;

ঘ) সকল খাতে পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ;

ঙ) সকল প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদী ও পরিবেশ উপযোগী ব্যবহার; এবং

চ) পরিবেশ সংক্রান্ত সকল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগের কার্যকরী সমন্বয়।

সরকারের বনায়ন নীতি ও বিশ বছর মেয়াদী বনায়ন মহাপরিকল্পনা ছাড়াও জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কর্ম পরিকল্পনা (এনইএমএপি) চূড়ান্ত হয়েছে যা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সকল পর্যায়ের জনগণের পরামর্শে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই এনইএমএপি প্রণয়নে সকল সচেতন লোকদের নিকট হতে পরিবেশ সমস্যার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং এসব সমস্যা সমাধানে তাদের পরামর্শ কাজে লাগানো হয়েছে। এটা পরিবেশ বিষয়ে সরকার, এনজিও এবং জনগণের সমন্বিত প্রচেস্টার ফসল। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে আরো অন্যান্য খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং জাতীয় জ্বালানী নীতি।

সুপারিশমালা

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বনোন্নয়নে যতটা না অর্থনৈতিক কারণে জরুরী তার থেকেও বেশি জরুরী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে। প্রয়োজনীয় মাত্রায় বনোন্নয়ন একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে সমৃদ্ধির সোপান সৃষ্টি করে তেমনি এর অপ্রতুলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বনায়ন ও বনোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক) বনায়নের জন্য পদক্ষেপসমূহঃ

১) সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

২) বন সংরক্ষণে যুগোপযোগী ও কঠোরতর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।

৩) বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির অনাবৃত এলাকায় সুষ্ঠু পুনর্জন্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে গবেষণার মাধ্যমে 'স্থান-প্রজাতি'র যথোপযুক্ততা যাচাই এবং রোপণযোগ্য বিভিন্ন প্রজাতির সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ' ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪) উপকূলীয় বনায়নের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য উপকূলের সম্মূখভাবে নারিকেল, খেজুর, তাল জাতীয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত গ্রীণ বেল্ট সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৫) যে সবএলাকায় বনায়নের সুযোগ রযেছে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন করা;

৬) গ্রামীণ বনায়ন প্রক্রিয়া আরো জোদরার করা প্রয়োজন। সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদোগে বনায়নে অংশগ্রহণ করার জন্য জাতীয় ও গণ প্রচার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৭) জ্বালানী কাঠের ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রণ আকারে স্বল্পমেয়াদী আবর্তক জাতের বৃক্ষ বা দ্রুতবর্ধনশীল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ও ভূমি ব্যবহার নীতিমালায় বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার।

৯) শহর ও নগর বসতির ধরন, ভূমিমূল্য ও ভূমির অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে পরিবেশ সম্মত ও কার্যকর বনায়নের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

খ) কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার কমানোর পদক্ষেপ সমূহঃ

১) চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে জনসাধারণের কাছে সলিড কাঠের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে বিকল্প দ্রব্যাদি যেমন পারটেক্স ইত্যাদির ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২) কাঠ আহরণ ও চেলাইকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধান করতে হবে যাতে কাঠ নষ্ট না হয়।

৩) দীর্ঘায়ু করার জন্য কাঠ ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা দরকার।

৪) ১৯৮৯ সাল থেকে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫) কাঠ ব্যতীত বিকল্প জ্বালানী যেমন গ্যাস, তেল, বৈদ্যুতিক চুলা, সৌরচুল্লী ইত্যাদির সরবরাহ ও ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ) সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহঃ

১) প্রশাসনের ভেতর কাঠামো শক্তিশালী ও যথার্থ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২) বন-আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সংশোধিত বন আইনে (১৯৮৯) এগুলোর সংযোজন ঘটাতে হবে।

৩) অসদুপায় ও অননুমোদিত বনোৎসাদনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) বৃক্ষের রোপণোত্তর পরিচর্যা ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে এবং তার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

৫) গৃহীত প্রকল্পসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহের সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৬) উন্নয়নের সকল পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষার কথা বিবেচনা করে Sustainable Development বা টেকসই উন্নয়নের নিমিত্তে আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৭) বনোজাড়ে বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতির বিপর্যয় এবং তার কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলার জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমসহ ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের মোট ভূমির ৬-৮ শতাংশ প্রাকৃতিক বনভূমি বিবেচিত যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। এক জরিপ হতে দেখা যায় বন ধ্বংসের ৫০ শতাংশ গত বিশ বছরে সংঘটিত হয়েছে যা ভূমির উপরের অংশকে প্রভাবিত করছে এবং ভূমি ক্ষয় করছে। এই বন উজাড়করণকে এখনো সামাজিক বনায়ন এবং বসতবাটি সংলগ্ন বনায়ন দ্বারা পূরণ করা হয়নি। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল উন্নয়ন অংশীদার যথাঃ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশিকা

GOB (1990) *The Fourth Five Year Plan.* 1990-95. Dhaka : Planning Commission.

GOB (1991) *National Conservation Strategy of Bangladesh-Towar Sustainable Development.* Dhaka : Ministry of Environment & Forest.

GOB (1995) *Participatory Perspective, Plan for Bangladesh* 1995-2010. Dhaka: Planing Commission.

GOB (1998) *The Fifth Five Year Plan.* 1997-2000. Dhaka : Planning Commission.

Hossain, Ekram and Kazi Hasan Imam (2002) *Legal Framework for Environment and Sustainable Agricultural Resource Management in Bangladesh.* Dhaka : BPATC.

Khan, Sadruddin Aga (1986). *The Vanishing Forest.*

ইমাম কাজী হাসান (১৯৯৯) *পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন-বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত।* ঢাকা ঃ প্যারাগণ পাবলিশার্স।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৯) *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯২) *পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম।* ঢাকা ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

সিদ্দিকী, কামাল ও সৈয়দ সালামত আলী (১৯৯৪) *বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা ম্যানুয়েল।* ঢাকা ঃ এনআইএলজি।

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

পরিবেশ আইন ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মেহেদী মাসুদ *

Environmental Law: Bangladesh Perspective

Mehedi Masud

Abstract. It is an undeniable fact that environmental law goes a long way in resolving the problem of environmental pollution. Since law has a binding effect, appropriate laws of environment should be enacted. Violation of environmental law on the part of a citizen would compile him to face consequences. To this end, a mass awareness program should be initiated specifying the consequences of the violation of environmental law. We must bear it in mind that life on earth depends on the proper maintenance of it. Therefore, judicial remedies need to be enforced and proper initiatives need to be undertaken to protect our environment and save the lives on earth. This paper attempts to discuss the environmental law in the context of Bangladesh. It also examines the judicial remedies and initiatives for protection environment in short.

পৃথিবীর সবদেশেই আত্মহনন প্রচেষ্টা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মানব জাতি এই আত্মহনন প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে পরিবেশ ধ্বংসের মাধ্যমে, যার নিদর্শন আমাদের চারপাশে বিস্তৃত। ব্রাজিলের রেইন ফরেষ্ট, ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকার তুসার শুভ্র হিমালয় এবং মেরুপ্রদেশও এই সর্বগ্রাসী দূষণের কবল থেকে মুক্ত নয়। এই ক্রমবর্ধমান পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য দরকার সম্মিলিত প্রয়াস, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, পরিবেশ বান্ধব আইন ও আইনী অনুশাসন এবং সর্বোপরি টিকে থাকার আকুতি। সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব এই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। নরওয়ের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Grow Garlem Bruntland এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই Our Common Future নামে প্রকাশিত পুস্তকের মুখবন্ধে উল্লেখ করছিলেন, "The Environment is

---

* প্রশিক্ষণার্থী, পঞ্চবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, বিপিএটিসি।

where we live" (Bruntland, 1987:Foreword) অর্থাৎ এই ব্যাপারটি স্বতঃসিদ্ধ যে ধরিত্রীর বুকে জীবন প্রবাহের জন্য দরকার পরিবেশের সুষ্ঠু সংরক্ষণ। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য চাই একটি সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থা যা দূষণমুক্ত পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম। পরিবেশ আইন এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে বহুলাংশে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের আদালত ও বিচার ব্যবস্থা পরিবেশ ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবেশ দূষণ এমন একটি বিষয় যেখানে আপামর জনগণের স্বার্থ জড়িত। জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একমাত্র আদালতই সঠিক সিদ্ধান্ত/রায় প্রদান করতে পারে।

পরিবেশ আইন একটি ব্যাপক বিষয়। এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্বল্প পরিসরে একটি দুঃসাধ্য কাজ। অন্য কথায়, প্রায় অসম্ভব। তাই পরিবেশ আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ শুধুমাত্র এই নিবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, আলোচ্য নিবন্ধে পরিবেশ আইন এবং রাষ্ট্রীয় অপরাপর অধ্যাদেশ ও আইন যেগুলো পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সেগুলা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বাংলাদেশ হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২- এটি সরাসরি কোন পরিবেশ আইন নয়। তা সত্ত্বেও এটি আলোচনায় এসেছে কেননা এই অধ্যাদেশের ৫ (২) অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগ

১৯৭২ সনে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় UN Conference on Human Environment। এই সম্মেলনে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ষ্টকহোম সম্মেলনের ফলো-আপ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রকল্প শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে। পানি দূষণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ ঘোষণার মাধ্যমে প্রকল্পটির যাত্রা শুরু হয়। মূলতঃ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণই ছিল প্রকল্পটির লক্ষ্য। ১৯৭৭ সালে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হয় প্লানিং কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে। এছাড়া একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠিত হয় একই সালে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৩নং অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র খনিজ সম্পদের কথা বলা হয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সংবিধানের কোথাও নেই। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি নইমুদ্দিনের পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্যঃ "Although by sub Clauses (a) and (b) of clause (1) of the Article 143, all minerals and others things underlying any land and all lands minerals and other things of value underlying the ocean within the territory of Bangladesh vest in the Republic, no specific provision has been made anywhere in the constitution for protection of environment" (Naimuddin, 1997). পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক কিছু বিধি বিধানের উল্লেখ Cr.Pcতে রয়েছে। Cr.Pc-র ১০ ও ১১ অধ্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাবলিক পার্ক এ্যাক্ট ১৯০৪, স্মোক ন্যূইস্যান্স এ্যাক্ট ১৯০৫, ডেস্ট্রাকটিভ ইনসেক্টস এন্ড পেস্টস এ্যাক্ট ১৯১৪, প্রিজনস এ্যাক্ট ১৯১৯, এগ্রিকালচারাল এন্ড সেনিটারী ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট ১৯২০, মাইনস এ্যাক্ট ১৯২৩, দি ফ্যাকট্রিস এ্যাক্ট ১৯৬৫, বাংলাদেশ হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ প্রভৃতি আইনে পরিবেশ দূষণ ও এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সনে পরিবেশ নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. এটা সুসংবদ্ধ, পরিকল্পিত ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে জনশক্তি ব্যবহারকে নিশ্চিত করে।

২. এটা পরিবেশ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে, সরকারের জনসংখ্যা নীতি বিষয়ে সমৃদ্ধ ধারণার সূত্রপাত করে ও তদসংক্রান্ত এ্যাকশন প্রোগ্রামে সহায়তা করে।

৩. এটা উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে।

৪. এটা বেকার জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল স্তরে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহ প্রদান করে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২ এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

১. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সঠিক উন্নয়ন।

২. দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করা।

৩. সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

৪. সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৫. সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

৬. পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে যথা সম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ এর আইনগত কাঠামো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, নীতিতে প্রথমেই প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে বর্তমান আইন সময়োপযোগী করে সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ নীতি ১৯৯২ এর আইনগত কাঠামো নিম্নরূপঃ

- ❑ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করে সংশোধন।
- ❑ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন।
- ❑ প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এ সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি।
- ❑ পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তা অনুমোদন এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রচেষ্টা/ফলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

অর্থাৎ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে দূষণেরও প্রকৃতিগত/মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রচলিত আইনের সংশোধনের

প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এই পরিবেশ নীতিতে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

পরিবেশ নীতিতে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে নারীর অংশগ্রহণের ধারণাটি। সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সকল দিকই পরিবেশ নীতিতে স্থান পেয়েছে। মোটামুটিভাবে এ যাবত প্রণীত আইনসমূহ, যেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশ রক্ষার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোকে চারভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. স্থানীয় সরকারগুলোর কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহঃ বেঙ্গল লোকাল সেলফ গর্ভনমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯, বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৩৫, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩১, যার সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ হলো পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭। এ ছাড়া আরো রয়েছে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩। উপর্যুক্ত আইন-অধ্যাদেশসমূহে পরিবেশের কিছু কিছু উপাদান যেমনঃ বৃক্ষরোপণ, পুকুর খননের মাধ্যমে পানীয়জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। তেমনি ৬ (ঞ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাস্তার পাশে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও তার সংরক্ষণ করতে হবে।

২. পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন ঃ ফ্যাকট্রিজ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ এবং ফ্যাকট্রি রুলস, ১৯৭৯ এর আওতায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশকে একটি শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফাকট্রি রুলস ১৯৭৯ এ সুনির্দিষ্ট রূপে বলা হয়েছে যে, কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের জন্য দায়ী থাকবে। টি প্ল্যানটেশন লেবার অর্ডিন্যান্স ১৯৬২, শপ্স এন্ড এষ্টাবলিশমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৬৫, পেষ্টিসাইড অর্ডিন্যান্স ১৯৭১, এগ্রিকালচারাল পেস্টিসাইড্স (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৮০ এবং এগ্রিকালচারাল পেষ্টিসাইডস অর্ডিন্যান্স (এমেন্ডমেন্ট), ১৯৮৩ দ্বারা কর্মপরিবেশে পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার

নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন ও পুষ্টি স্তর বাড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক আইন ঃ বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ, বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন পাশ করেছে। ফরেষ্ট্রি এ্যাক্ট এর আওতায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিধান রয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলকে সংরক্ষিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ (প্রিজার্ভেশন) অর্ডর ১৯৭৩, ইষ্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অফ ফিশ (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৮২, মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ প্রভৃতি আইন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপর আলোকপাত করেছে।

৪. পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত আইন ঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয় পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭০ এর মাধ্যমে। স্বাধীনতাত্তোর কালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ (সংশোধিত) ১৯৭৩এ কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। এই আইনটি শুধুমাত্র পানি দূষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বায়ুদূষণ, শিল্প-বর্জ্য, এই সব বিষয় এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলনা। এই সীমাবদ্ধতাবোধ থেকে নতুন একটি সর্বব্যাপী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলশ্রুতিতে সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭৭ জারী করেন। এই আইনে পানি দূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ পরিবেশ নীতির ৪.২ অনুচ্ছেদের আওতায় প্রণীত হয়েছে। আইনের অনুচ্ছেদ ২ (খ), (ঘ) (ঞ), অনুচ্ছেদ ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২০ আংশিক ও পরোক্ষভাবে কৃষি পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। এই আইনবলে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও আইন লংঘনের শাস্তির বিধান হয়েছে এই আইনে। কিন্তু সীমিত জনবল, কারিগরি জ্ঞানের অভাবে আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অনুচ্ছেদ ৮এ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা

পরিচালককে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছেঃ

১. পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহা পরিচালককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

২. এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদত্ত কোন আবেদন নিষ্পত্তিকল্পে মহাপরিচালক শুনানিসহ যে কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন।

৩. যে ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন অভাবিত কাজ অথবা ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ নির্গত হয় বা নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করতে বাধ্য থাকবেন।

৪. উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তি মহা পরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করবেন।

৫. এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হলে মহা পরিচালক যতশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং মহাপরিচালকের চাহিদা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি মহা পরিচালককে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

৬. এই অনুচ্ছেদের অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হতে মহা পরিচালকের পাওনা হবে এবং তা সরকারী দাবী হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ১৫অনুচ্ছেদে আইন ভঙ্গের যে সব দন্ড উল্লেখ করা আছে সেগুলো হলোঃ

১. যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা বিধির লঙ্ঘন করেন অথবা আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তা হলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

২. কোন শিল্প কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী অথবা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মহা পরিচালক হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বা ওজর ব্যতীত সাহায্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন বা তাকে দায়িত্ব সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব ঘটান বা বাধাদান করেন তা হলে তিনি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক। কিন্তু কৃষি পরিবেশের উপর পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালাটি প্রকৃতপক্ষে শিল্প কারখানার উপরই গুরুত্ব প্রদান করেছে।

জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (NEMAP), ১৯৯৫

১৯৯২ সনে ইউএনডিপি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টাদের সহায়তায় জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সনে দুই বার সরকারের প্রয়াস সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১৯৯৫ সনে পরিকল্পনাটি পূণর্মূল্যায়নের পর পুনঃপ্রণীত হয়। এই পরিকল্পনায় কীটনাশক ব্যবহারের ফলে উদ্ভুত সমস্যা হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ, জমির উর্বরতা হ্রাস, জৈব বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সাথে সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শও এই পরিকল্পনায় দেয়া হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (NEMAP), ১৯৯৫ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত করেছে যেগুলি যথাযথভাবে সম্বোধিত হলে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু হবে বলে আশা করা যায়। পরিবেশগত ইস্যুসমূহ সারণী ১-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণী ১। পরিবেশগত ইস্যু

প্রতিষ্ঠানিক ইস্যু	খাতওয়ারী ইস্যু	স্থানগত ইস্যু	দীর্ঘমেয়াদী ইস্যু
আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়; জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; জনগণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া, আইন প্রণয়ন ও মনিটরিং।	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, জৈব বৈচিত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শিক্ষা, পানি, কৃষি, শক্তি, মৎস্য সম্পদ, ভূমি, আবাসন এবং পরিবহন।	লবণাক্ততা, চিংড়ি চাষ উপকূলীয় সামুদ্রিক ইস্যু বরেন্দ্রভূমি, জলাভূমি, পাহাড় কাটা।	আঞ্চলিক পানির হিস্যা নগরায়ন, পরিবহন, গবেষণা ও উন্নয়ন।

সূত্রঃ ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট (1999) ফর লাইফ অন আর্থ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরিবেশ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. বীজের মান বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল (এইচওয়াইভি) এবং সংকর বীজের মানোন্নয়ন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা;

২. স্বল্প ব্যয়ে কৃষি উপকরণ সরবরাহের উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপর অধিক নির্ভরতার মাধ্যমে আধুনিক সেচ ও কম ঝুঁকি সমন্বিত কৃষির প্রতিষ্ঠা; এ জন্য গণখাতের বিনিয়োগকে অধিকতর কার্যকর করা হবে। এমন সব গুরুত্বপর্ণ ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ করা হবে যাতে ব্যক্তি উদ্যোগ উৎসাহিত হয়;

৩. কৃষি গবেষণা এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে যাতে ফসলের জাত, খামার ব্যবস্থা, জৈব উপকরণভিত্তিক খামার, উন্নত কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থা এবং কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ (processing) সংক্রান্ত নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং রক্ষিত প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসার ঘটে;

৪. পরিবেশ-অনুকূল এবং টেকসই প্রযুক্তি যেমন সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশল এবং জৈব ও জীবভিত্তিক সারের ব্যবহারের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করা হবে;

৫. সুষম শস্য উৎপাদন এবং জনগণের পুষ্টি-মানের (nutritional status) উন্নয়নের জন্য অ-প্রধান শস্যসমূহের লাভ জনক উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে;

৬. বৃষ্টি নির্ভর এলাকা, শুষ্ক অঞ্চল এবং জলাভূমি কৃষি ব্যবস্থার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হবে;

৭. ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমির জৈব পদার্থের উন্নততর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জৈব সারের উৎপাদন এবং ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৮. উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিজস্ব উদ্যোগে গঠিত কৃষি পণ্যের ব্যবসা অব্যাহত রাখা, অধিক পরিমাণে ঋণকৃত পুঁজি সাফল্যের সাথে ব্যবহার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি গ্রহণ এবং তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা যাতে জোট ও সমিতি গঠন করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৯. কৃষির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

১০. জার্ম প্লাসম (Germ plasm) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও কৌল (Family) সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হবে;

১১. বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

১২. কৃষি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের স্বার্থে সমন্বিত ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করা হবে;

১৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিজ ও গ্রামীণ অর্থনীতি যে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা সহনীয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৪. গ্রামীণ যুব মহিলা এবং যুবকেরা যাতে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামর্থের উন্নয়ন করা হবে;

১৫. পরিবর্তিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা হবে;

১৬. ফসল কাটার পরবর্তী সময়ে শস্যহীন এবং শস্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করার জন্য ফসল উৎপাদন ও আহরণের পরবর্তী পর্যায়সমূহের জন্য জুতসই এলাকাভিত্তিক ব্যয় সংকোচন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিস্তার ঘটানো হবে; এবং

১৭. টেকসই কৃষি সহায়ক নীতি গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ রীতি প্রয়োগ করা হবে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, সরকার টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা এখানে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও জৈব সার ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। পরিবেশ আইন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই একটি নয়া সংযোজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি নবীনতম। তথাপি পরিবেশ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা অবশ্যই আশা-সঞ্চারক। এটা ঠিক যে অসম্পূর্ণ ও সেকেলে আইন দ্বারা প্রায়শই বর্তমান চাহিদার নিরিখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পরিবেশগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব নয় দুটি কারণেঃ (ক) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও (খ) সংবিধিবদ্ধ পরিবেশগত মানের অনুপস্থিতি যার ভিত্তিতে অপরাপর মান যাচাই করা সম্ভব। আসলে আইনে শাস্তিমূলক বিধান না থাকায় আইন ভঙ্গকারীরা পার পেয়ে যায়।

আইনী প্রতিকার

আধুনিক পরিবেশ আইনে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জনবলের অভাবেই হোক বা ইচ্ছার অভাবেই হোক, দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসসমূহ পরিবেশ আইন বাস্তবায়নে কোন না কোনভাবে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় একজন ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক তিনটি উপায়ে আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারে– (১) দূষণকারীর বিরুদ্ধে Tort Law Action; (২) রিট পিটিশন দায়ের করা যাতে করে সরকারী প্রতিষ্ঠানটি বাধ্য হয় আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে এবং (৩) নাগরিক অধিকার ক্ষুন্নের মামলা।

সাধারণ পাবলিক ন্যূইন্যান্স, অবহেলা প্রভৃতি কারণে Tort Law Action নেয়া হয়। আইনবিদগণ nuisance এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে "A nuisance is an unlawful interference with the plaintiff's use for enjoyment of land. Of the two kinds of nuisances, public nuisance injures, annoys, interferes with the quality of life of a class of persons within a neighbourhood. অপরের জীবন যাত্রা বা শান্তিপূর্ণ জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই পাবলিক নুইন্যান্স। পাবলিক নুইন্যান্সের আইনী প্রতিকারসমূহ হচ্ছে- (১) স্পেশাল কোড ১৮৬০ এর সেকশন ২৬৮ অনুযায়ী ফৌজদারী মামলা রুজু করা এবং (২) Cr. Pc-র সেকশন ১৩৩-১৪৪ অনুযায়ী পাবলিক ন্যূইন্যান্স দূরীকরণের লক্ষ্যে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায়। আর অবহেলা জাতীয় ব্যাপারে ফরিয়াদীকে অবশ্যই এটা প্রমাণ করতে হবে যে, (১) বিবাদী কর্তব্যরত ছিলেন এবং কর্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন এবং (২) কর্তব্যে অবহেলার কারণে ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতের মুকেশ টেক্সটাইল মিলস কেস, ১৯৮৭ এর কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে রিট আবেদন করা যায়।

উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক যাবতীয় কর্মকৌশল ও পন্থাসমূহের মধ্যে আইনগত পন্থাই অধিকতর ফলপ্রসূ। কেননা আইন মান্য করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধান রয়েছে। সুতরাং পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশ আইন যথার্থ ভূমিকা রাখবে। এজন্য দরকার পুরাতন আইনের সংস্কার সাধন, নতুন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন। প্রয়োজনে পরিবেশপ্রেমিক নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স মওকুফের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে অন্যান্য সকলেই উৎসাহিত হয়। সম্প্রতি ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে পরিবেশ কর (Environmental Tax) আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮৯ সনে বৃটেনে সীসা মিশ্রিত পেট্রোলের (Leaded Petrol) উপর ৮% বেশী ট্যাক্স আরোপ করা হয়। কেননা সীসা মিশ্রিত পেট্রোল পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশেও আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা) পরিবেশ আন্দোলনে

সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রয়োজনে এনভায়রনমেন্টাল অডিট (Environmental Audit) ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে প্রতি মহল্লায়। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ আদালত স্থাপনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। ১০ই এপ্রিল, ২০০০ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পরিবেশ আদালত বিলে স্বাক্ষর করেন। পরিবেশ আদালত স্থাপিত হলে পরিবেশ ইস্যু আরো জোরদার হবে। সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সনে বেলা Eco-System বিনষ্টের জন্য ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে বেলা মামলায় জয়লাভ করে। সুতরাং একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আইনের একটি অবশ্য পালনীয় প্রভাব রয়েছে। শুধুমাত্র আইনেরই রয়েছে বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেয়ার ক্ষমতা। এজন্য প্রচলিত আইনসমূহ বাস্তবতার নিরিখে সংশোধন করে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ পূর্ববর্তী বাতিলকৃত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেকেলে ও অকার্যকর বিবেচিত হওয়ার কারণে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশে, ১৯৭৭ বাতিল করা হয়।

তথ্য নির্দেশিকা

Agnihotri S. P. (1992) *Environment Conservation Management and Planning.* New Delhi: Chugh Publication.

Ahmed, Naimuddin (1997) *Public Interest Environment Litigation in Bangladesh.* Dhaka : BELA.

Aminullah (1992) *Environment and Development.* Peshawar: Pakistan Academy for Rural Development.

Benedick, R. E (1991) Ozone Diplomacy : *New Directions in safe guarding the Planet.* USA : Harvard University Press.

Bruntland Grow Garlen (1987) *Our Common Future.* Report of the World Commission on Environment and Development. London: Oxford University Press.

Farooque, Mahiuddin (1997) *Laws and Custom on Forests in Bangladesh: Issues and Remedies.* Dhaka: BELA.

GOB. (1999) *For Life on Earth.* Dhaka : Department of Environment.

GOB (1998) *Fifth Five Year Plan 1997-2002.* Dhaka : Planning Commission.

Mathur Mahesh (1996) *Legal Control of Environmental Pollution's : Jurisprudence and laws applicable to environmental violation and prevention.* New Delhi : Deep & Deep Publications.

Miller, A.L.M (1995) *The Third World in Global Environmental Politics.* London : Bucking ham University Press.

Sapru, R.K. ed. (1987) *Environment Management in India.* New Delhi : Ashish Publishing House.

UNEP (1990) *Profile.* Nairobi: UNEP

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

ভাষা আন্দোলনঃ আত্মপরিচয়ের সন্ধান

মোঃ শরীফ হাছান *

Language Movement: Quest for Identity.

Md. Sharif Hasan

Abstract. Language Movement is a glorious event in our national history. It was our first organized protest against the Pakistani colonial rulers. The Pakistan rulers tried to impose Urdu as the only state language in Pakistan which covered only seven percent of the total population. On the other hand, Bangla was the mother tongue of fifty six percent people of the country. The Bangalees fought back and laid down their lives to uphold the dignity of their mother tongue. It was the first stage of our struggle against the Pakistani colonial rulers which ended with the nine-month long bloody war and Bangladesh emerged as an independent country on 16th December 1971. The emergence of Bangladesh owes a lot to the great Language Movement and it will remain source of inspiration for the oppressed people of the whole world forever. The article aims to analyze the background and major events of Language Movement and its impact on the social and political life of Bangladesh specially the War of Independence in 1971.

দু'হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার অধিকারী বাঙালী জাতি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে চরমতম ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য ও নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকরা বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করার এক ক্রুর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু বাঙালীর সময়োচিত ও সুদৃঢ় প্রতিরোধের ফলে এ নীল নকশা ব্যর্থ হয়। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগ ও সাফল্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রদর্শক, নিত্য দিনের চলার পথের প্রেরণা।

---

* প্রশিক্ষণার্থী, পঞ্চবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, বিপিএটিসি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা ভাষার মর্যাদা

প্রাচীন যুগে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পায়নি। অনার্যদের পরাজিত করে বাংলা দখল করতে আর্যদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত আর্যদের বিভিন্ন পুস্তকে বাঙালীদের পক্ষী, রাক্ষস পিশাচ ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। কেউ বাংলা ভাষার চর্চা করলে তাঁর স্থান পরকালে রৌরব নামক নরকে হবে বলে সংস্কৃতজ্ঞ ধর্মগুরুদের অনেকে ভীতি প্রদর্শন করতেন সাধারণ বাঙালীদের। কোন সাহসী আর্য যুবক বাংলায় প্রবেশ করলে আর্যাবর্তে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তার কপালে কলংক চিহ্ন এঁকে দেয়া হতো। প্রাচীন বাংলার শাসকদের মধ্যে একমাত্র শশাংক ব্যতীত অন্য কারো বাঙালীত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার উপায় নেই। গুপ্ত এবং পাল শাসকেরা বাঙালী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে আগত সেন শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। সংস্কৃত ছিলো রাজভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত। আপামর জনগণের ভাষা বাংলা ছিলো অবহেলিত। সমাজের উচ্চশ্রেণী বাংলা ভাষার প্রতি ছিলো উন্নাসিক। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগে ব্রাত্যজনেরাই বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয় (১২০১-১২০৪) এর মাধ্যমে বঙ্গদেশে মধ্যযুগের সূচনা হয়। রাজভাষা হিসেবে সংস্কৃতের স্থান দখল করে ফার্সী। ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বঙ্গদেশের অধীশ্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা করেন। বাংলা ভাষার মরা গাঙ্গে এলো জোয়ার। এতদিনের অবহেলিত বাংলা ভাষার চর্চা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোশকতায় হতে থাকে ঋদ্ধ। পরবর্তীতে হোসেন শাহী বংশের শাসনামলে এ পৃষ্ঠপোষকতা থাকে অব্যাহত। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, আবদুল হাকিম, মালাধর বসুর হাতে রচিত হতে থাকে বিখ্যাত মঙ্গল কাব্যসহ অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্য কর্ম। সহজিয়া মতবাদ বাংলা সাহিত্যকে করে সমৃদ্ধতর, বাঙালীর জীবনে সমন্বয়বাদের সূচনা হয় এ সময়েই। তবে বাংলার প্রতি উন্নাসিকতা সমাজের একাংশের মধ্যে তখনো ছিলো সক্রিয়। মাতৃভাষা বিদ্বেষী এ শ্রেণীকে কটাক্ষ করে আবদুল হাকিম লিখলেন (আখতার, ১৯৮৫)ঃ

"যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।"

ফার্সী রাজভাষা হলে ও বাংলা ভাষার চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়নি। এ সময় বিশেষতঃ নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের একটা বিরাট অংশ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেও বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করেনি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয় এ সময়ে। প্রকৃতপক্ষে সুলতানী আমল ছিলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইল ফলকস্বরূপ। এর মূলে বাঙালী সাহিত্যিকদের পাশাপাশি এসব ভিন্নভাষী সুলতান ও তাঁদের অমাত্যদের অবদান অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ যুগ

১৭৫৭ সনে বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ডি'রোজিওর নেতৃত্বে ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলন প্রথমদিকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দিলেও ধীরে ধীরে এর মধ্যে স্বজাতি এবং মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্বেষের প্রবণতা দেখা যায়। ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অনেকে শুদ্ধভাবে বাংলা লিখেত পড়তে এমনকি বলতে পর্যন্ত পারতেন না। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ইংরেজীর মোহে পড়ে বাংলাকে জেলে মজুরের ভাষা বলে অবজ্ঞা করেছিলেন। পরবর্তীকালের নব জাগরণ ক্ষেত্র বিশেষে কলকাতায় ও তার আশেপাশে সীমিত থাকলেও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এর অবদান অপরিসীম। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর) বাংলা ভাষাকে আধুনিক রূপ দান করেন। সংস্কৃত প্রীতিতে আচ্ছন্ন পন্ডিতশ্রেণীর হাতে এজন্য বিদ্যাসাগরকে নিন্দিত এমনকি প্রাণনাশের প্রচেষ্টারও মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। ফলে শ্রীমন্ত নামক এক লাঠিয়ালকে বিদ্যাসাগরের প্রাণ রক্ষায় নিয়োজিত করা হয়েছিলো। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষার প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। পাশাপাশি বাংলা বিদ্বেষী ভুল ইংরেজী বলায় পারদর্শী বাবু শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সেবার দার্জিলিং এ গিয়েছিলুম। গিয়ে দু'টো জিনিস দেখলুম। হিমালয় পর্বত অচল অটল, বিস্তৃত। আর দেখলুম বিলেত ফেরত বাঙ্গালী, না জানে বাংলা না জানে ইংরেজী।" ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষও রোপণ করে যা কালক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়।

বাংলা না উর্দূ? মুঘল আমলে সেনানিবাসে জন্মলাভ করে উর্দু ভাষা। প্রধানত ভারতের যুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) এর কিছু অভিজাত ব্যক্তির ভাষা ছিলো উর্দু। ব্রিটিশের বিভেদনীতি এবং হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ঈর্ষা-বিদ্বেষের ফলে জন্ম নেয় দ্বি-জাতি তত্ত্ব। উইলিয়াম হান্টারের মুসলমান প্রীতির নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং এক শ্রেণীর হিন্দু লেখকের মুসলমান শাসকদের চরিত্র হনন সাম্প্রদায়িকতার বিষ বৃক্ষে জল সিঞ্চন করে। বাংলা ভাষাকে একদিকে আরবী-ফারসী অন্যদিকে সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত করার চেষ্টা চলে। এ প্রসঙ্গে ডঃ শহীদুল্লাহ বলেন (আখতার, ১৯৮৫)ঃ "একদল চাচ্ছে বাংলাকে বলি দিতে আর একদল চাচ্ছে জবেহ্ করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।" ভারত ভাগের আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে সুপারিশ করেন যদিও উর্দু পাকিস্তানের কোন অংশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা নয়। এর জবাবে জ্ঞান তাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের দাবী জানান।

পাকিস্তান ও বাঙালীর স্বপ্ন ভঙ্গ

সাম্প্রদায়িক ও মধ্যযুগীয় মতবাদ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ইতিহাসের এক অস্বাভাবিক বাঁক গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট জন্ম নেয় কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশের অহমিকা, সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের হীনমন্যতা ও সর্বোপরি ব্রিটিশের ভেদনীতির ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাময়িকভাবে হলেও পরস্পরের প্রতি হয়ে পড়ে বৈরী ভাবাপন্ন যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তুলেছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাঙালী মুসলমানগণ। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্নেই শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতিকে দাবিয়ে রাখার নীল নকশা প্রণয়নে নিয়োজিত হয়।

যে কোন সভ্য জাতির জাতিসত্ত্বার প্রাণ নিহিত রয়েছে তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। বাঙালী জাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। একটি জাতিকে আত্মবিস্মৃত, স্থবির

করে তার উপর ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণের প্রক্রিয়া চিরস্থায়ী করতে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন এর ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবালের অবদানে সমৃদ্ধ উর্দু ভাষাকে বাংলা ভাষার উপর চাপিয়ে দিয়ে বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বাঙালীদের নির্বীর্য জাতিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র আটে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। নতুন রাষ্ট্রের মোহে আচ্ছন্ন বাঙালীরাও প্রথমদিকে খেজুরগাছ ও উটের মধ্যে নিজ শিকড় সন্ধানে ছিলো ব্যস্ত। কিন্তু ভ্রান্তি বিলাস কখনো চিরস্থায়ী হয় না। একটি গোটা জাতিকে চিরতরে নেশাগ্রস্ত করে রাখা যায় না। অবাস্তব ও মধ্যযুগীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের স্বরূপ বাঙালীদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। বাদামী পাঞ্জাবীরা যে শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, শোষণের প্রক্রিয়া যে বন্ধ হয়নি তা ধীরে ধীরে বাঙালীর মানসলোকে ধরা পড়তে লাগলো।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। প্রথম দিনেই পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব করেন। প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ নাকচ করে একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং এমনকি শ্রী দত্তের ধর্মীয় পরিচয়কে কটাক্ষ করে এর মধ্যে পাকিস্তান তথা মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, জাতীয় পরিষদের বাঙালী সদস্যদের কেউই তখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পাশে দাঁড়াননি।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালেই প্রধানতঃ গণ আজাদী লীগ এবং তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জনমত গঠন চলতে থাকে। বক্তৃতা, বিবৃতি, সভা-সমাবেশ এবং লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালীদের ভাষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস পায় উল্লিখিত দু'টি সংগঠন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব নাকচ হওয়া এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লিয়াকত আলী খানের বক্তব্য বাঙালী জাতির জন্য ছিলো চরম অবমাননাকর। ফলে রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নের বাঙালীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং চিন্তা চেতনায় অগ্রসর শ্রেণীর সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মানসিক বন্ধন ক্রমেই শিথিল হতে থাকে।

পাকিস্তান গণ পরিষদের বাংলা বিরোধী অবস্থান এবং মুসলিম লীগের বাংলা বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকায় ছাত্র, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভা আহ্বান করা হয়। কামরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভাষার সংগ্রামকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শামসুল আলমকে আহবায়ক করে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমুদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে দু'-দু'জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পরিষদ ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ঐদিন ঢাকা এবং পূর্ব বঙ্গের আরো কয়েকটি স্থানে পালিত হয় ধর্মঘট। ঢাকায় হাইকোর্টে এবং সচিবালয়ের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সচিবালয়ের সামনে পিকেটিংরত অবস্থায় অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেফতার বরণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান ও কাজী গোলাম মাহবুব।

১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক প্রতিনিধিদল পূর্ব বাংলার চীফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর সরকারী বাসভবন বর্ধমান ভবনে সাক্ষাৎ করেন। তুমুল বাক-বিতন্ডার পর নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে নাজিমুদ্দীন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার জন্য প্রস্তাব আনবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন। এ ছাড়া ভাষার দাবীতে আন্দোলনকারীগণ বিদেশীদের চর–এ উক্তিও প্রত্যাহার করা হয়। চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা কারাবন্দী ভাষা আন্দোলনকারী অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক প্রমুখকে দেখানোর পর তাঁরা চুক্তিটি অনুমোদন করেন।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশ বিভাগ পরবর্তী প্রথম ও শেষ বারের মত ঢাকায় আগমন করেন। তিনি ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঢাকার নাগরিকদের প্রদত্ত সংবর্ধনায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে বলে মন্তব্য করেন।

অথচ বর্তমান গুজরাটের কাথিওয়াড়ের অধিবাসী মিঃ জিন্নাহ্ নিজেও ভালোমাতো উর্দু বলতে পারতেন না। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর বিরোধিতাকারীদের তিনি রাষ্ট্রের শত্রু এবং বিদেশের চর বলেও অভিহিত করেন। মিঃ জিন্নাহর এ বক্তব্যে সভাস্থলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও মৃদু গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়, তবে তা ব্যাপক আকার ধারণ করেনি।

২৪শে মার্চ, সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে মিঃ জিন্নাহর সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেও মিঃ জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর রেসকোর্সের ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করলে (বিচারপতি) হাবিবুর রহমান এবং আবদুল মতিনসহ উপস্থিত ছাত্রদের কয়েকজন তৎক্ষণাৎ "না" "না" বলে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের মধ্যে জিন্নাহ সাহেব তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যান এবং রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত অপরিবর্তিত রাখেন। একই দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জিন্নাহ সাহেব বলেন যে ১৫ই মার্চ খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে জোর করে চুক্তিতে সই নেয়া হয়েছে তাই তিনি এ চুক্তিকে স্বীকার করেন না। উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে জিন্নাহ সাহেব পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ মিঃ জিন্নাহর কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালে ঢাকায় আগমন করেন। তখন ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি লিয়াকত আলী খানের কাছে পেশ করে। ৬ই এপ্রিল নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

বাংলা বিরোধী চক্রান্ত ও আরবী হরফে বাংলা লেখা

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতি বিরোধী চক্রান্ত চলতেই থাকে। প্রচার করা হয় যে, বাংলা বর্ণমালা যথেষ্ট আধুনিক নয় ও হিন্দুস্থানী

বৈশিষ্ট্যের ধারক। তাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে আরবী হরফে বাংলা লেখার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদের মতে, পাকিস্তানের দু অংশের জনগণের বর্ণমালা অভিন্ন হলে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হবে। এ চক্রান্ত দানা বাধে ১৯৪৯সালে। ১৯৫০ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর আরবী হরফে বাংলা লেখার ২০টি কেন্দ্র স্থাপন করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায়। আরবী হরফে বাংলা বই ছাপার জন্য সরকার পুরো খরচ বহন করে। আবরী হরফে বাংলা বই ছাপানোর জন্য সরকারীভাবে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কবি গোলাম মোস্তফা এ উদ্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আরবী হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে ১৯৫০ সালের ৪ঠা অক্টোবর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সরকারী চক্রান্ত চলতেই থাকে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু বাংলা বই আরবী হরফে ছাপা হলেও মহাকালের গর্ভে সেগুলো বুদ্বুদের মতোই হারিয়ে যায়। কালক্রমে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভাঁটা পড়ায় হরফ পরিবর্তনের এ উদ্যোগ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট ইসলামী নয়, একে ইসলামীকরণ করতে হবে– এ মর্মে সরকারী প্রচারণা চলতে থাকে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টানদের সম্মিলিত অবদানে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা। অথচ এ সময় রবীন্দ্রনাথকে বর্জন ও নজরুলকে খন্ডিতভাবে গ্রহণ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। এরূপ সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার অংশ হিসেবে মুসলিম বাঙালীর কালচার বা পাকবাংলার কালচারের ধারণা প্রচারেরও অপপ্রয়াস চালানো হয়। বাংলা ভাষাকে অহেতুক আরবী, ফার্সী শব্দে ভারাক্রান্ত করে এর খোল-নলচে বদলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। খাঁটি পাকিস্তানী হওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথকেও ত্যাগ করবো–এমন ধ্যান ধারণা প্রচার করা হয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় (আজাদ, ১৯৮৮)।

বাঙালী মধ্যবিত্ত পাক শাসকগোষ্ঠীর এ চক্রান্ত অচিরেই বুঝতে পারে। সাময়িক বিভ্রান্তি কাটিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত আবার উজ্জীবিত হয় বাঙালী চেতনায়, প্রতিরোধে শামিল হয় বাঙালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার পাকিস্তানী কুটিল

চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নাম দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়। এর কার্যক্রম ক্রমে জোরদার হতে থাকে। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রধামন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়।

নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে ছাত্র সমাজ তথা জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয় ৩০শে জানুয়ারী। ৩১শে জানুয়ারী কাজী গোলাম মাহবুবের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে চল্লিশ সদস্যের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আহুত ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা এবং আরবী হরফে বাংলা লেখার অপপ্রয়াসেরও নিন্দা করা হয়।

১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ধর্মঘটের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। সেখানে কয়েক হাজার ছাত্রের সমাবেশে পল্টন ময়দানে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার নিন্দা জানিয়ে ১৯৪৮ সালের চুক্তি পালনের জন্য তাঁর প্রতি আহবান জানানো হয়। প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে এ মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেন (এডভোকেট) গাজীউল হক। সভাপতি হিসেবে গাজীউল হকের নাম প্রস্তাব করেন মুস্তাফা রওশন (এম আর) আখতার মুকুল আর সমর্থন করেন কামরুদ্দীন শহুদ। ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রাদেশিক গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিকেলের সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহবান করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা থেকে আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভাষার দাবী চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে সরকার এবং আন্দোলনরত ছাত্র জনতা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারী কী ঘটবে এ নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে শংকা দেখা দেয়।

১৯৫২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী কারাগারে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও বরিশালের মহিউদ্দীন আহমদ ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ঢাকা জেলে অনশন ধর্মঘটন শুরু করেন। ঐদিনই তাঁদের ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। পথিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ ষ্টিমার ঘাটে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায়ই শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। এ সময় জনাব মহিউদ্দিনের নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিলো (সারওয়ার, ২০০০)।

২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫টায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে নবাবপুরে অবস্থিত আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনই বিকাল ৩টার দিকে ঢাকা শহরে ত্রিশ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা না করা নিয়ে সভায় উত্তপ্ত আলোচনা হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সমর্থক তরুণ ছাত্রনেতা হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরোধিতাকারী আওয়ামী লীগ সম্পাদক শামসুল হকের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। অলি আহাদ এবং আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন। অবশেষে বিষয়টি ভোটে দেয়া হয়। ভোটাভুটিতে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একজন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন এবং এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গভীর রাতে (আখতার, ১৯৮৫)। সন্ধায় ফজলুল হক মুসলিম হল এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে যথাক্রমে আবদুল মোমিন এবং ফকির শাহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুটি সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে জানিয়ে দেয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কিনা তা ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেই চূড়ান্ত করা হবে।

ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী

বায়ান্নের ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই ঢাকার ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমবেত হতে শুরু করে। সব ছাত্রছাত্রীর গন্তব্য একটাই- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। পুলিশে দেখে ছাত্রদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সকাল দশটায় আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্রদের সমাবেশ শুরু হয়। একটি টেবিলের উপর দাড়িয়ে গাজীউল হক এ মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে বিপক্ষে বক্তব্য রাখা হয়। অবশেষে সভাপতি তার ভাষণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ছাত্র ছাত্রীরা এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এবং উত্তেজিত হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে শ্লোগন দিতে থাকে। সিদ্ধান্ত হয় দশ জন করে মিছিল নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। সে অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে প্রথম দলটি এগিয়ে যায় মিছিল নিয়ে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাদের গ্রেফতার করে গাড়িতে তোলে। এ রকম বেশ কয়েকটি দশজনের মিছিল গ্রেফতার বরণ করে। মেয়েদের প্রথম দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাফিয়া খাতুন। পুলিশ এ দলটিকেও গ্রেফতার করে। ইতোমধ্যে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এক পর্যায়ে একটি টিয়ার গ্যাসের সেল সরাসরি গাজীউল হকের বুকে আঘাত করলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁকে ধরাধরি করে মেয়েদের কমনরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি চালায়। বাঙালীর রক্তে সেদিন ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হলো। পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত হলেন (উমর, ১৯৯৩)।

ভাষার দাবীতে প্রাণ বিসর্জন বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম। ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট আহবান করায় সকাল থেকেই বহু দোকানপাট বন্ধ থাকে এবং যানবাহন চলাচলও কম ছিলো। কিন্তু ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের সংবাদে দোকানপাট এবং যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তিন শহীদের লাশ আত্মীয় স্বজনের কাছে হস্তান্তর না করে পুলিশি তত্ত্বাবধানে ঐদিনই রাতে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়। সেদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দুজন ছাত্র পুলিশের পিছু নিয়ে গোপনে শহীদদের কবরগুলো দেখে চিহ্নিত করে আসেন (আখতার, ১৯৮৫)।

গুলির্ষণের পর ছাত্ররা ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল) সামনে গিয়ে চিৎকার করে সদস্যদের বেরিয়ে আসতে বলে। মওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ, মনোরঞ্জন ধর ও বীরেন্দ্রনাথ দত্ত অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার দাবী জানান যাতে সদস্যগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং হাসপাতালে গিয়ে হতাহতদের দেখে আসতে পারেন। তাঁরা এ বিষয়ে চীফ মিনিস্টার নূরুল আমিনের বিবৃতিও দাবী করেন। নুরুল আমিন এতে সম্মত হননি। পুলিশী নির্যাতন ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। মেডিক্যাল হোস্টেলের একটি কক্ষে মাইক বসিয়ে ছাত্ররা আগে থেকেই বক্তৃতা করছিল। তর্কবাগীশ হোস্টেলে গিয়ে সেই মাইকে ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে নিহতদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ হাজার লোক এতে অংশ নেয়। মাওলানা ভাসানীর এতে ইমামতি করার কথা থাকলেও তিনি আসতে পারেননি। অনুরূপ চেহারার এক শ্মশ্রুমন্ডিত বৃদ্ধ সেদিন জানাজায় ইমামতি ও জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছিলেন (আখতার, ১৯৮৫)। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। শান্তিপূর্ণ এ মিছিল হাইকোর্টের সামনে পৌছালে পুলিশ মিছিলের মাঝামাঝি জায়গায় লাঠিচার্জ করে। মিছিলটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একাংশ স্কুলের সামনে পুনরায় লাঠিচার্জের ফলে ছাত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে। অপর অংশ নবাবপুর মোড়ে পৌছালে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে একটি বালকসহ কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হন। এদিন নবাবপুরে মরণ চাঁদের মিষ্টির দোকানের সামনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর রহমান। ভাষা আন্দোলনকে কটাক্ষ করে সংবাদ পরিবেশন করায় জনতা সেদিন মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়। মুসলিম লীগের মালিকানাধীন সংবাদ পত্রিকার অফিসও আক্রমণ করে জনতা। ২১ এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী কমপক্ষে ৮জন পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন (উমর, ১৯৯৩)। এদের অন্যতম এমএ ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত, সালাহউদ্দিন, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউর রহমান প্রমুখ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণে শহীদের স্মরণে নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার। অচিরেই এটা পুলিশ কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এদিকে মুসলিম লীগ সরকারও নিষ্ক্রিয় ছিল না। তাঁরা তাঁদের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে বিদেশী চরদের কারসাজি হিসেবে বিরামহীন প্রচার করতে থাকে। মুসলিম লীগের মুখপত্র আজাদ পত্রিকা প্রথমদিকে আন্দোলনের পক্ষে থাকলেও ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে এর সুর বদলে যেতে থাকে। এদিন আজাদ পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনকে বেআইনীভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারী হিন্দুদের কারসাজী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১লা মার্চ নারায়ণগঞ্জে জনৈক পুলিশ কনস্টেবল গুপ্তহত্যার শিকার হন। সরকার এ হত্যাকান্ডকে কমিউনিষ্ট ও বিদেশী চরদের কর্ম বলে অভিহিত করে এবং নিহতের পরিবারকে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পাশাপাশি চলতে থাকে ধরপাকড়। ৫ই মার্চ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সর্বদলীয়ভাবে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ঢাকায় ব্যর্থ হলেও সারা পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। এতদসত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার নির্যাতন কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। এ অবস্থায় মার্চের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ আন্দোলনে সাময়িক ভাটা পড়ে। তবে জনতার ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি।

মহান ভাষা আন্দোলনের ফলাফল

মহান ভাষা আন্দোলনের ফলাফল ছিলো সূদুরপ্রসারী। এর ফলে বাঙালীর জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত চিন্তধারায় পরিবর্তনে সূচনা হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মায়াজালে বাঙালীরা যে তথাকথিত ধর্মাশ্রিত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের মোহে আবিষ্ট হয়েছিলো তা ফিকে হয়ে আসতে থাকে ভাষা আন্দোলনের ফলে। বাঙালী সত্ত্বার বিকাশের সূচনা হল। ইরান, তুরান, আরব ভূমির পরিবর্তে বাঙালী নিজ ভূমিতে পেলো আপনার উৎসের সন্ধান। ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের যাত্রা শুরু হলো, এ জাতীয়তাবোদেই বাঙালী জাতিকে ৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। ভাষা আন্দোলন ছাড়া তা সম্ভব হতো না। তাই বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনকে অভিহিত করেছেন বাঙালী মুসলমানের নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন হিসেবে (উমর, ১৯৯৩)। ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদই মহান ভাষা আন্দোলনের মহত্তম অর্জন।

ভাষা আন্দোলনের অনিবার্য ফল হিবেবে পূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম লীগ প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে ২১শ ফেব্রুয়ারী স্মরণে ২১ দফা কর্মসূচি নিয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লীগ ধরাশায়ী হয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন সহ সকল মন্ত্রী নির্বাচনে পরাজিত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী জাতির অগ্রসর শ্রেণীর মনে এ বোধ জাগ্রত হয় যে পাকিস্তানী শাসনে বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর হাজার বছরের সংস্কৃতি নিরাপদ নয়। চাপিয়ে দেয়া উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে পিষ্ট করা যে পাকিস্তানী শাসকদের অভিপ্রায় ছিলো এটা বুঝতে দেশপ্রেমিক বাঙালীদের অসুবিধা হলো না। ফলে বাঙালী জাতি আপন ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা ও স্বকীয়তা রক্ষায় হলো দৃঢ় সংকল্প। এ দৃঢ়তা ও সচেতনতা প্রাগ্রসর শ্রেণী থেকে ক্রমশ সাধারণ বাঙালীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। অন্যদিকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালীকে সাংস্কৃতিকভাবে পঙ্গু করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চালাতে থাকে নানামুখী আক্রমণ। কিন্তু একুশের তথা ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী জাতি এ সব আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয় অপরিসীম দৃঢ়তার সঙ্গে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালনে সরকারী বাধা উপেক্ষা করে বাঙালী জাতি পাকিস্তানী শাসকদের চক্রান্তের উপযুক্ত জবাব দেয়। মহান ভাষা আন্দোলনে এক্ষেত্রে জুগিয়েছে প্রেরণা। পাকিস্তানবাদী চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বাঙালী জাতির বিচ্ছিন্নতার সূচনা হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই। এ বিচ্ছিন্নতা প্রথমদিকে সমাজের উপর তলার এবং তরুণ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশ তা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করে। এ বিচ্ছিন্নতাবোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে।

পাকিস্তানী আমলের প্রথম দিকে রচিত বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই নবলব্ধ রাষ্ট্রের বন্দনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ভাষা আন্দোলনের পর এ ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সূচিত হয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হতে থাকে অসংখ্য গল্প,

কবিতা, উপন্যাস, গান। এসব সাহিত্য কর্মের কোন কোনটিতে আবেগের আতিশয্য থাকলেও এদের অনেকগুলোই বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়।

হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি ছিলো ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সহজিয়া মতবাদ প্রভাবিত। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানদের সম্মিলিত অবদানে এ সংস্কৃতি হয়েছে পরিপুষ্ট। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনার ফলে বিংশ শতব্দীর প্রথমদিকে বাংলার সংস্কৃতিক জীবনে এ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলার সাংস্কৃতিক জগত সাম্প্রদায়িকতার ক্লেদে হয় কলুষিত। বাঙালী সংস্কৃতির মিলনাত্মক বৈশিষ্ট্য হয় ক্ষুন্ন। এ ভূখন্ডের অধিবাসীগণ বাঙালীর পরিবর্তে হিন্দু, মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হলো। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে নেমে এলো এক অদ্ভুত আঁধার ও বন্ধ্যাত্ব। এ অন্ধকার যুগ পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। মহান ভাষা আন্দোলনের ফলে এ অন্ধকার যুগের অবসানের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এলো এক নতুন জোয়ার। বাঙালী জাতি পুনরুদ্ধার করলো তার হারিয়ে যাওয়া বাঙালী সত্ত্বাকে যা এতদিন ধর্মীয় পরিচয়ের আড়ালে চাপা পড়েছিলো। মহান ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় সঞ্জিবিত বাঙালী ঢাকাকে কেন্দ্র করে আপন জাতি সত্ত্বা বিকাশে নিয়োজিত হলো।

বর্তমানে একথা অনস্বীকার্য যে ঢাকা কেন্দ্রীক বাংলা সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যের মূলধারা। কারণ ভারতের বহু ভাষার মধ্যে বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা অন্যদিকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, ঢাকাই এক সময় বাংলা সাহিত্যের রাজধানীতে পরিণত হবে। আন্দোলনকারীদের দাবী মেনে নিয়ে পরবর্তীকালে প্রধামন্ত্রীর সরকারী বাসভবনবর্ধমান ভবনকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমীতে পরিণত করা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে বাংলা একাডেমীর অবদান অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন বাঙালীদের প্রথম সংঘটিত আন্দোলন। বাঙালী জাতির পরবর্তী সকল আন্দোলনে ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণা দান করে।

ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত এ ভূখন্ডের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের আসাম রাজ্যে অসমিয়া ভাষার সঙ্গে বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা করার দাবী উপেক্ষিত হলে শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলী চালালে শচীনপাল, সুনীল, মাধুরীসহ আটজন বাংলা ভাষাভাষী প্রাণ বিসর্জন দেন। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন যে তাদের এ চরমতম আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিলো এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উপসংহার

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ মহান ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চরমতম প্রকাশ একুশে ফেব্রুয়ারী তাই প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙালীর আত্মার আত্মীয়। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা শুধু নয় মাসের যুদ্ধের ফসল নয়। আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯ এর রক্তাক্ত সোপান পেরিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চরম পরিণতি লাভ করে। ২৪ বছরের পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভাষা আন্দোলন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন বিশেষ করে ২১শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানী নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির ক্রোধের বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। সেদিন যদি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বাঙালীদের উপর উর্দু চাপিয়ে দিতে সক্ষম হতো তবে আজ আমরা কি অবস্থায় দিন যাপন করতাম তা ভাবাও দুঃস্বপ্নের মতো।

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভাষা আন্দোলনের ছাত্র-যুব নেতাদের অধিকাংশই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি যুদ্ধে মুখ্য কুশীলবের ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই দেশের অগ্রসর শ্রেণীর মন থেকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের কালো পর্দা সরে যেতে থাকে। দেড় দশকের মধ্যেই দ্বি-জাতি তত্ত্ব তথা পাকিস্তানবাদী চেতনা থেকে বিকাশমান মধ্য শ্রেণী নিজেদের বিযুক্ত করতে সক্ষম হয়ে দেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান রাখা হলে মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব উক্ত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী পাকিস্তানকে 'ওলায়কুম আচ্ছালাম' জানান। এক যুগ পর

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেন এখন থেকে এ ভূখন্ডের নাম বাংলা- বাংলাদেশ। ডঃ আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী অধিকাংশ ছাত্র যুবকই কৃষক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই পরবর্তীতে বিকশিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে (রহমান ও হাশেমী, ১৯৯১)।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে আমাদের সমাজে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার নামে এক ধরনের কূপমন্ডূকতা আবির্ভূত হয়েছে। মহান ভাষা আন্দোলন কোন বিশেষ ভাষার বিরুদ্ধে ছিলনা এটা ছিলো সংখ্যাগুরুর ভাষাকে পাশ কাটিয়ে সংখ্যালঘুর ভাষা চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ। একথা স্বীকার করতে হবে আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের সিংহদুয়ার হলো ইংরেজী ভাষা। তাই বিশ্বায়নের এ যুগে সম্মানের মাঝে টিকে থাকতে হলে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজীসহ অন্যান্য ভাষাও শিখতে হবে। কিন্তু মাতৃভাষাকে কোনক্রমেই অবহেলা করা যাবে না। কারণ মাতৃভাষার জ্ঞান ভিন্ন কোন জ্ঞানই পূর্ণতা পায়না।

সম্প্রতি কানাডা প্রবাসী বাঙালীদ্বয় সালাম ও রফিকের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সরকারের ত্বড়িৎ ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এ স্বীকৃতি বাঙালী জাতিকে করেছে গৌরবান্বিত। এটা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের চরমতম আত্মত্যাগের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি। এখন থেকে জাতিসংঘের বাকী ১৮৮টি সদস্য দেশেও পালিত হবে ২১শে ফেব্রুয়ারী,গীত হবে অমর ভাষা শহীদের বীরত্ব গাঁথা। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই গর্বের বিষয়। অভাব, অজ্ঞতা, ক্ষুধার দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ আরেকটি পরিচয়ে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হলো আর তা হলো ভাষা শহীদের দেশ। ভাষা আন্দোলন' ২১ ফেব্রুয়ারী এবং শহীদ মিনার আমাদের সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল ধর্মের বাঙালীর মিলন মেলা আমাদের শহীদ মিনার। শহীদ মিনার সকল ধরনের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে এক মূর্ত প্রতিবাদ। তাই আমাদের সকল সংগ্রামের সূচনা হয় শহীদ মিনারেই। যতদিন বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি এবং বাংলা ভাষা

বিশ্বের বুকে টিকে থাকবে ততদিন ভাষা আন্দোলন, ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং শহীদ মিনার স্বমহিমায় থাকবে সমুজ্জ্বল।

তথ্য নির্দেশিকা

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৮৮) *সাপ্তাহিক নিপুণ, ঈদ সংখ্যা*। ঢাকা।

আহ্মদ কামরুদ্দীন (১৯৭৬) *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও রাজনীতি*। ঢাকা ঃ ইনসাইড লাইব্রেরী।

আহমদ ফয়েজ (১৯৮৭) *মধ্যরাতের অশ্বারোহী*। ঢাকা ঃ সন্ধানী প্রকাশনী।

ইসলাম সিরাজুল (১৯৯৫) *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*। ঢাকা ঃএশিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম সাইফুল (১৯৮৭) *স্বাধীনতা, ভাসানী, ভারত*। ঢাকা ঃ অয়ন প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৫) *ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল*। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৩) ভাষা আন্দোলন। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯৪) *পূর্ব পশ্চিম*। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৬) *দুই বাঙালীর লাহোর যাত্রা*। ঢাকা ঃ আফসার ব্রাদার্স।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৪) *বাঙালীর জয় পরাজয়*। ঢাকা ঃ বিদ্যাপ্রকাশ।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৩) *দ্বি-জাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা*। ঢাকাঃ বিদ্যাপ্রকাশ।

মুকুল, এম আর আখতার (১৯৮৫) *বাহান্নর জবানবন্দী*। ঢাকা ঃ সাগর পাবলিশার্স।

রহমান, আতিউর ও সৈয়দ হাশেমী (১৯৯১) *ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান*। ঢাকা ঃ গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

সারওয়ার, মুস্তাফা (২০০০) *টিভি সাক্ষাৎকার*, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

হোসেন, সেলিনা (১৯৮৯) *নিরন্তর ঘন্টা ধ্বনি*। ঢাকা ঃ মুক্তধারা।

হোসেন, সেলিনা (১৯৯৩) *গায়ত্রী সন্ধ্যা*, ঢাকা ঃ মুক্তধারা।

Wali, Khan Abdul (1988) *Facts of Facts*. Dhaka: UPL.

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

সচিবালয়ে কর্মরত সিভিল অফিসারদের অবসর ও বিনোদন

মোঃ শফিকুল হক *

Leisure Behaviour of the Civil Servants Working at the Bangladesh Secretariat. Md. Shafiqul Haque

Abstract. Leisure and recreation are indispensable part of human being. Man works for subsistence. Food, sleep, and minimum hygiene are necessary for living. Civil servants are not exceptions. As human being they also work to make living. After necessary work they also spend some amount of item for pleasure. Present study is an effort to examine the pattern of leisure and recreation of civil servants (working at Bangladesh Secretariat), problems of participating in recreation activities and demand for essential recreation facilities. The study observed great importance of leisure for civil servants residing at Dhaka a swarming city of the country. Although leisure and recreation are mentioned as a constitutional right but civil servants are yet to fully attain this right. Five important measures for providing recreation facilities to the government officials are recreation allowance, one-month compulsory recreation leave once a year, community-based library, ladies club/ladies park and establishment of new parks/open spaces/lakes. Out of 1331 class-1 officers, working at Bangladesh Secretariat, 131 have been interviewed. Primary data for the study have been collected by administering a pre-tested questionnaire. Apart from this, secondary data have also been collected from secondary sources such as: books, periodicals dissertation, journals etc.

অবসর ও বিনোদন প্রতিটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মানুষের একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৪৮সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণার ২৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

---

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

every man has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay (UNIFO, 1983:7). গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(গ) সংখ্যক অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার অর্জন নিশ্চিত করার বিষয়টি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৮ ঃ ১১)।

বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, পরিবেশ দূষণ, যানজট, দারিদ্র, বস্তি, আবাসন সংকট, অপ্রতুল পরিবহন সুবিধা, অপর্যাপ্ত পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও বিনোদন সুবিধাদিসহ নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে কর্মরত কর্মকর্তাগণও এসব সমস্যা থেকে মুক্ত নন। সরকারি অফিস আদালতে রোববার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাঁচদিন কাজ হয়। শুক্র ও শনি দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি। দুপুরের খাবার/নামাজের জন্য ১৫মিনিট মধ্যাহ্ন বিরতিসহ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস চলে। অর্থাৎ ৮ ঘন্টা কর্মদিবস হিসেবে ৪০ঘন্টা কর্মসপ্তাহ। কিন্তু ৮ ঘন্টা কর্মদিবস হলেও অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতিসহ কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য গড়পড়তায় আরও ২ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। সচিবালয়ের প্রায় সব কর্মকর্তাই ঢাকা শহরে বসবাস করেন এবং শহরের অন্যান্য অধিবাসীদের মত সমস্যা জর্জরিত নগরের ভোগান্তিও তাদেরকে পোহাতে হয়। প্রতিদিনের কাজের শেষে ক্লান্তি নিরসনের জন্য অন্যান্য মানুষের মত সরকারী কর্মকর্তাদেরও কিছুটা অবসর দরকার হয় যা তারা বিনোদনের জন্য ব্যয় করতে পারেন। এই অবসর পরবর্তী দিনের কাজের জন্য তাদেরকে শারিরীক ও মানসিকভাবে সতেজ করতে নিশ্চিতভাবে সহায়তা করে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে কর্মকর্তাগণকে আবিশ্যকভাবে পারিবারিক দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়। এই সময়ের পরিমাণ ব্যক্তিভেদে, কর্মকর্তাভেদে ভিন্ন হতে পারে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের শেষে তাদের

হাতে কিছুটা সময় থাকতে পারে যা তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেন।

কর্মকর্তাদের অবসরের পরিমাণ যাই হোক না কেন, ইতিবাচকভাবে অবসর কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ঢাকা শহরে অত্যান্ত সীমিত। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঢাকা শহরবাসীদের দৈনিক গড় অবসরের পরিমাণ ৩.৬১ ঘন্টা এবং চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৩.৫৫ ঘন্টা (হক ১৯৯৫ঃ ৫৭, ৮০)। উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে দৈনিক গড় অবসর সময় হচ্ছে, আমেরিকানদের ৫.৭৬ ঘন্টা, ফরাসীদের ৪.৮ ঘন্ট, ডেনিশদের ৬.৭২ ঘন্টা এবং ওলন্দাজদের ৭.৬৬ ঘন্টা (Franklin, 1988 quoted in Leitner et al., 1989:344)। উন্নত বিশ্বের তুলনায় ঢাকা শহরবাসীর অবসর কম হওয়ার কারণ হিসেবে প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, মাথাপিছু নিম্ন আয় হেতু জীবিকার্জনের নিরন্তর তাগিদকে চিহ্নিত করা যেতে পারে (হক, ১৯৯৫ঃ৫৭ ৮০)। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, বিনোদন সুবিধাদির অপর্যাপ্ততা ঢাকা শহরবাসীকে গৃহকেন্দ্রিক অবসর কর্মকান্ডে বাধ্য করছে (হক, ১৯৯৫ঃ৮০)। চাকরিজীবীদের অধিকাংশের মতে অবসর হলো জীবন-জীবিকা ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজের শেষে অবশিষ্ট সময় যা স্বেচ্ছায় আনন্দের জন্য ব্যয় করা হয় (হক, ১৯৯৫ঃ৯৯)। অবসর সম্পর্কে তাদের এই ধারণা উন্নত বিশ্বের অবসর সম্পর্কিত গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হয় (Bucher and Bucher, 1974:6)।

উন্নত বিশ্বে অবসর গবেষণা জ্ঞানের আলাদা একটি শাখা হিসেবে বিকশিত হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবসর বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা লক্ষ্য করা যায় না। যদিও বাংলাদেশে অবসর সম্পর্কে নগণ্য সংখ্যক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে কিন্তু এর কোনটিই সরকারি কর্মচারীদের অবসর ও বিনোদন নিয়ে আলোকপাত করেনি।(Noman, A. et al., 1962; Nabi, A.S.M., 1978; Siddiqui, M.M.R., 1990)। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্তমান গবেষণায় আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

অবসর ও বিনোদনের ধারণাগত দিক

অবসর হচ্ছে সেইসব কাজ যা একজন ব্যক্তি তার মুক্ত সময়ে নিজ পছন্দ মত আনন্দ, শ্লথন (relaxation) ও আত্ম-পরিতৃপ্তি, অথবা সামাজিক উপকারের উদ্দেশ্য করে থাকে (Konek and Kitch, 1994 : 176)। অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে মানুষ ঘুমাতে পারে, রাত জাগতে পারে, রেস্তোরাঁয় খেতে যেতে পারে, কিন্তু এগুলো অত্যাবশ্যকীয় কাজে মধ্যে পড়ে না। অবসর হচ্ছে পেশা, চাকরি বা কোন ধরনের কর্ম সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা (Brightbill, 1960 :3)। অন্য কথায় কাজ করা বা না করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত সময়ই হচ্ছে অবসর (Hendon, 1981 :25)। অবসর হচ্ছে সময়ের একটি মাত্রা এবং সাধারণতঃ কাজ, ঘুম এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালির দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট সময়কে অবসর বুঝায় (Boniface, et. al., 1990:1)। অর্থাৎ জীবন জীবিকার প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক কর্তব্য ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কার্যাদি শেষে ব্যক্তি যে মুক্ত সময় স্বেচ্ছায় নিজের আনন্দের জন্য ব্যয় করে সেই সময়ই হচ্ছে অবসর (Bucher & Bucher, 1974:6)। অবসর হচ্ছে কোন ব্যক্তির স্বঅধীনতা। অবসর সময় মুক্ত সময় বা স্বেচ্ছাধীন সময়ের সমার্থক। অবসরের প্রায় সব সংজ্ঞাতেই তিনটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা যায় (Knoek and Kitch, 1994 : 176)ঃ

অ) স্বেচ্ছাধীন সময় হিসেবে অবসরঃ জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্বের প্রয়োজন (যেমন, পেশা ও গৃহস্থালির কাজ) শেষে অবশিষ্ট অবাধ বা মুক্ত সময়।

আ) স্বেচ্ছাধীন সক্রিয়তা হিসেবে অবসরঃ সেই সব কাজ যেগুলো অবশ্যই স্বাধীনভাবে নির্বাচিত বা পছন্দকৃত, কোন ধরনের প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতার উপস্থিতি নেই।

ই) চেতনাগত অবস্থা হিসেবে অবসরঃ স্বকীয় প্রণোদনা ও তৃপ্তি অবসরের অন্তর্ভুক্ত; কারণ অন্তর্নিহিতভাবে তৃপ্তিকর বলে একজন ব্যক্তি অবসর

সক্রিয়তায় অংশ নেয় (Haywood, Kew and Branham, 1989; Iso-Ahola, 1980; Kelly, 1982; Neulinger, 1980, 1981)।

সকল সমাজের জনসংখ্যার সকল আর্থ-সামাজিক স্তরেই অবসর ও বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অবসর হচ্ছে কাজের পরিপূরক। বলা হয়ে থাকে যে, যার সন্তোষজনক কাজ ও অবসর রয়েছে তার চেয়ে সেই ব্যক্তি কম বিকশিত (এবং সম্ভবতঃ কম সুখী) যার শুধুই জীবন, অথবা প্রধানতঃ কাজ বা অবসর রয়েছে (Parker, 1991: 24)। যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির অবসর সময়কে সন্তোষজনক ও গঠনমূলক বিনোদনে ব্যবহারের জন্য সুবিধাদি অপর্যাপ্ত থাকে তাহলে সে বা তারা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়; অবসরের জন্য সুবিধাদির অনুপস্থিতি সুখ ও মুক্তির পরিবর্তে বিরক্তি ও অতৃপ্তি নিয়ে আসে। অবসর মানুষকে আত্মপ্রকাশ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মোন্নয়নের চমৎকার সুযোগ এনে দিতে পারে (Vannier, 1977:8)।

কাজ ও অবসর

কাজ হচ্ছে প্রবৃদ্ধির প্রতীক যা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন প্রেরণা জোগায়। কাজ অভীষ্ট ও কার্যোপযোগী অনুভূতি সৃষ্টি করে যা আমাদের আত্ম-মর্যাদার জন্য অপরিহার্য Brightbill, 1960 :5)। যে কোন ধরনের শারীরিক এবং/অথবা মানসিক ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ অধিকতর ব্যবহারপযোগী হয়, পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও ধারণা উন্নত হয়-এবং/অথবা অন্যের জন্য দ্রব্য উৎপাদন বা সরবরাহ করা যায় তাকে কাজ (Work) বলা যেতে পারে (Brown, 1985:908)।

অবসর সময় কাজের (Work) সময় থেকে পৃথক। এর অর্থ এই নয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের সময় এবং স্বতন্ত্র একটি অবসর সময় রয়েছে, বাস্তবতঃ উভয়ের ক্ষেত্রে একটি প্রাবরণ (Overlap) রয়েছে। কাজ বা অবসরের ক্ষেত্রে সময়টাই মূখ্য। কাজের সময় কাজটিই মূখ্য যদিও কখনো কিছুটা অবসর

সেখানে থাকতে পারে। একইভাবে অবসর সময় হচ্ছে কর্মমুক্ত সময় কিন্তু কিছুটা কাজও সে সময় হতে পারে। অন্যভাবে কাজের সময়টুকু একান্তভাবে কিছু অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে জড়িত অন্যদিকে অবসর সময় হচ্ছে কাজ থেকে বা বাধ্যবাধ্যকতা থেকে মুক্ত সময়। কর্মহীন (No work) বাধ্যবাধকতা যেমন- ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ, নাগরিক কর্তব্য ইত্যাদি যেগুলো সহজাতভাবে কাজ নয়। কারণ ধর্মীয় কাজ কিংবা নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে এক ধরনের দায়িত্ববোধ রয়েছে। অবসর-এর ধারণায় এখানে কোন সত্যিকার স্বাধীনতা নেই। সুতরাং বলা যায় যে, অবসর হচ্ছে সেই সময় যা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মুক্ত সময়, যে অবাধ সময়ে কাজ করা বা না করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না।

অবসরের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অবসর হচ্ছে অন্তঃস্থ প্রণোদনায় গৃহীত সক্রিয়তার মাধ্যমে অর্জিত মনের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত অবস্থা (Kraus, 1984)। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত অর্থানুযায়ী অবসর খুবই উঁচুমানের একটি বিষয় এবং এটি অবশ্যই মনের ইতিবাচক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। এখানে মুক্ত সময় ও অবসর সমার্থক নয়। উদাহরণ হিসেবে একজন ব্যক্তির মুক্ত বা অবাধ সময়ে তাস খেলাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। অবসরের ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তাস খেলে ব্যয়িত সময় অবসর নয়, কিন্তু অবসরের অবাধ সময়ের ধারণা (Maclean et. al., 1985) অনুযায়ী এই সময়টি বাস্তবতঃ অবসর সময়। তবে এটি অবসর সময়ের দুর্বল বা নেতিবাচক ব্যবহার।

ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির মত প্রতিউপযোগিতা (Antiutilitarian) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অবসর মনের একটি অবস্থা (Neulinger, 1981 উদ্ধৃতি Leitner et. al. 1989:10)। তবে এখানে অবসরের উপকারিতা বা যৌক্তিকতা বিচেনা করা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি ইতিবাচক দিক হল এটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ

ও প্রচন্ড-পীড়নযুক্ত আধুনিক সমাজ জীবনে অধিক শিথিলতাপূর্ণ (relaxed) অবসরকে সমর্থন করে। অন্যদিকে এর প্রধান নেতিবাচক দিক হল, এটি সুস্থ আত্ম-উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত অবসর সক্রিয়তাসমূহের (তাস খেলা, অধিক মাত্রায় টিভি দেখা, বিনোদনের জন্য নেশা বা পান) পক্ষে সমর্থন দেয়। অবসরের প্রতিউপযোগিতার বিপরীতে রয়েছে সামাজিক হাতিয়ার (Social Instrument) দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে আত্ম-উন্নয়ন ও অপরকে সহায়তা করার উপায় হিসেবে অবসরকে বিবেচনা করা হয় (Neulinger, 1981 উদ্ধৃতি Leitner et al. 1989:10)। এই দৃষ্টিভঙ্গি মতে অবসরের অবশ্যই কার্যোপযোগিতা থাকবে। এই মতের একটি সমস্যা হল এখানে অবসর সম্পর্কে একটি পীড়নযুক্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যেখানে অবসর সময়ে গৃহীত সক্রিয়তায় অর্জনকে (achievement) অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে এর ভাল দিক হল এই দৃষ্টিভঙ্গি সুস্থ আত্ম-উন্নয়নের প্রতিবন্ধক সক্রিয়তাসমূহে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে।

অবসরকে সামাজিক শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করার একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা সামাজিক হাতিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবসর সময় ব্যবহার দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান অনুধাবন করা যায়। সম্পদের অধিকার দ্বারা অবসর সময় ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় (Karaus, 1984)। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে উদাহরণ হিসেবে গাড়িতে দীর্ঘভ্রমণ, ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁয় খাওয়া, গলফ/টেনিস/ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি অবসর সময়ের সক্রিয়তাসমূহ উল্লেখ করা যায় যেখানে ধনি-নির্ধন নির্বিশেষে সবাই সমভাবে অংশ নিতে পারে না। অবসরকে আবার অকর্ম (Non-Work) সক্রিয়তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Weiskopf, 1982)। অর্থাৎ এই মতানুযায়ী অবসর ও বিনোদন সমার্থক কিন্তু অবসর ও অবাধ সময় সমার্থক নয়। অন্যদিকে হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ ও অবসর ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা যায় না (Murphy, 1975)।

অবসর পিরামিড

অবসর সময়ে গৃহীত বিভিন্ন বিনোদন সক্রিয়তার মান/মূল্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে এই মডেলটি উপস্থাপন করা হয়েছে (Nash, 1960 উদ্ধৃতি Leitner et. al. 1989 : 79)। এই মডেলের মাধ্যমে বিনোদন সক্রিয়তাকে ৬টি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মডেলের উচ্চতর ধাপসমূহ অধিকতর উচ্চমান সম্পন্ন বিনোদন সক্রিয়তাকে এবং নিম্নতর ধাপসমূহ নিম্নমানের বিনোদন সক্রিয়তাকে প্রতিনিধিত্ব করছে (চিত্র ১)।

চিত্র ১। অবসর পিরামিড **(Nash Pyramid)**

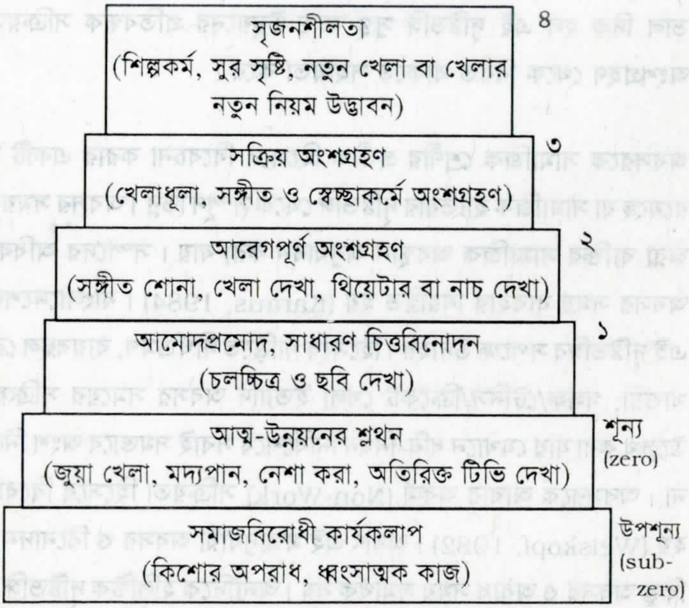

সূত্রঃ J. B. Nash (1960). Philosophy of Recreation and Leisure. [Quoted in Leitner et al.. (1989:80). Leisure Enhancement. New York: The Haworth.]

বিনোদন

অবসর সময়ে সংঘটিত সক্রিয়তা বা সক্রিয়তাসমূহ (স্বাধীনভাবে পছন্দকৃত নিষ্ক্রিয়তাসহ) হচ্ছে বিনোদন (Clawson & Knetsch, 1966:6) । বিনোদন বলতে প্রায়শঃ একটি নির্দিষ্ট ভূমিব্যবহার প্রকৃতি বা নির্দিষ্ট সক্রিয়তাকে বুঝায় (Smith, 1985:Xiv)। ভূবিদ্যার অভিধায় প্রাণশক্তির উজ্জীবন বা প্রমোদ উদ্দেশ্যে অবসর সময়ে গৃহীত সক্রিয়তাই হচ্ছে বিনোদন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেগুলো বহিরাঙ্গনে এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমির বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হয় (Clark, 1985)। বিনোদন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা এ তিনটির সমষ্টি হতে পারে। বিনোদন সংগঠিত, অসংগঠিত, পরিকল্পিত, অপরিকল্পিত, অবিরাম হতে পারে। বিনোদন স্বেচ্ছায় এবং বেসরকারী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় হতে পারে। কাজ, ভালবাসা ও ভক্তির মত বিনোদন অতি প্রাচীনকাল থেকেই এক ধরনের মানবিক সক্রিয়তা হিসেবে বিবেচিত (Butler, 1968:13)। বিনোদন মানুষের আত্মোন্মোচন, স্বস্তি/মুক্তি এবং জীবনের পথ প্রদর্শনে সমর্থ হয় (Butler, 1957)।

বিনোদন হচ্ছে সেই সব সক্রিয়তা যেখানে তৃপ্তি বা আনন্দের প্রণোদনায় একজন ব্যক্তি তাঁর অবসর সময়ে স্বেচ্ছায় অংশ নেয়; এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানসমূহের (আদর্শ, আকাঙক্ষা, ভয়, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি) উপর বিনোদনের একটি চূড়ান্ত প্রভাব রয়েছে (Meyer & Brightbill, 1959:28,40)। বিনোদন আবশ্যিকভাবে চিত্তবিনোদনমূলক সক্রিয়তা নিয়ে গঠিত যা প্রধানত ব্যক্তির অবসরসীমার মধ্যে তার আগ্রহ, আয়, পারিবারিক গঠন (কতিপয় ক্ষেত্রে) অনুসারে সংঘটিত হয় (Rabideau, 1977 : 399)। অবসর সময়ে ঘরের বাইরে সংঘটিত সক্রিয়তাসমূহ হচ্ছে বিনোদন (Johnston, et al., 1986:391) যা মূলতঃ ব্যক্তির কর্মশক্তি ও মননের নবায়ন ঘটায় (Boniface, et al., 1990:1) । বিনোদন মূলতঃ দৈনন্দিন ও প্রয়োজনীয় কাজের নবায়ন বা প্রস্তুতি বা কাজ থেকে মুক্তির একটি উপায় (Seely, 1973:1)। বিনোদনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের শ্রান্তির অপনোদন বা পুনরুদ্যম যা তাকে দক্ষভাবে

সেইসব কাজে ফিরিয়ে নেয় যেগুলো বিনোদন নয় কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক (Kaplan, 1980 উদ্ধৃতি seely, 1973:1)। বিনোদনের মাধ্যমে মানুষ সৃজনশীল, সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে (Vannier, 1977:8)। মানুষ অবসর সময়ে স্বেচ্ছায় যে সব নানাবিধ সক্রিয়তার মাধ্যমে আনন্দ ও তৃপ্তি অর্জন করে সে সব সক্রিয়তাই বিনোদন যেগুলো অন্তর্নিহিতভাবেই পারিতোষিক হিসেবে গণ্য হয় (Bucher & Bucher, 1974:4-5) । বিনোদন আরাম ও আমোদ প্রমোদের জোগান দেয় এবং ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের উপায় হিসেবে কাজ করে (Burton, 1971:19)।

বিনোদন সমীকরণ (Doell & Twardzik, 1963 : 26-7)

$$A+P_c+T+C \rightarrow P\,(A_n \pm A_c \pm R_e)$$
$$En(\pm Mn \pm Phy \pm Em)$$
$$+Ra \pm Im + Sa$$
$$= R$$

অর্থাৎ ব্যক্তিগত সততা বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ($I_m \pm S_a$) বিবেচনায় স্থান (P_c) বা কাল (T) বা পরিস্থিতি নির্বিশেষে (C) সংঘটিত যুক্তিসঙ্গতভাবে পছন্দকৃত (Ra) যে কোন মানবিক সক্রিয়তার (A) ফলে যে আনন্দময় প্রতিক্রিয়ার (P) সৃষ্টি হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি (En) ঘটে তার সমষ্টিগত ফলাফল হচ্ছে বিনোদন (R)। আনন্দময় প্রতিক্রিয়া (P) হচ্ছে পূর্বধারণা (An) বা বাস্তব সক্রিয়তা (A_c) বা সক্রিয়তার অনুস্মরণ(R_e)-এর একক অথবা এ তিনটির যে কোন ধরনের সম্মিলিত (±) রূপ; এবং অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি হচ্ছে মানসিক (Mn) বা শারীরিক (Phy) বা আবেগপূর্ণ (Em) সুফলের একক অথবা এ তিনটির যে কোন ধরনের সম্মিলিত রূপ (±)।

গবেষণা পদ্ধতি

উত্তরদাতা নির্বাচনে নমুনায়ন পদ্ধতিঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের লোক প্রশাসন কম্পিউটার সেন্টারের (PACC) হিসাব মতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে গবেষণাধীন

সময়ে (মার্চ, ১৯৯৯) ১৩৩১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন যাদের মধ্যে ১১৭৪জন পুরুষ ও ১৫৭ জন মহিলা। গবেষণার জন্য শতকরা ১০ ভাগ নমুনা হিসেবে সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যায়ের মোট ১৩৩ জন কর্মকর্তাকে উত্তরদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হলেও ১৩১ জন কর্মকর্তা গবেষণায় অংশ নেন (সারণী১)। দাপ্তরিক ব্যস্ততা ও অনাগ্রহের কারণে সচিবদের মধ্যে কাউকেই উত্তরদাতা হিসেবে পাওয়া যায়নি। উত্তরদাতাদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণী ১। পদমর্যাদা অনুযায়ী সমগ্রক ও নমুনার বিন্যাস

পদমর্যাদা	সমগ্রক (জন)	নমুনা	
		লক্ষ্যমাত্রা (১০%)	অর্জন (জন)
সচিব	৩৫	৪	–
অতিরিক্ত সচিব	১৬	৩	৩
যুগ্ম সচিব	১০৪	১১	১৮
উপ-সচিব	২৮৫	২৯	৩৯
সিনিয়র সহকারি সচিব	৫৮১	৫৮	৫৬
সহকারি সচিব	৩১০	৩১	১৫
মোট	১৩৩১	১৩৩	১৩১

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ একটি পূর্ব-পরীক্ষিত (Pre-tested) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গবেষণার জন্য প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বই, গবেষণা প্রতিবেদন, জার্ণাল ইত্যাদি হতে মাধ্যমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিঃ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রে মাসিক আয় সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন ছিল। যেমন-বেতন স্কেল, মাসিক বেতন, স্পাউজের আয় (যদি থাকে), অন্যান্য উৎস (কৃষি, বাড়ি ভাড়া, গবেষণা/কনসালটেন্সি ইত্যাদি) থেকে আয়। এ ছাড়া যুগ্ম-সচিব থেকে সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ আবাসিক টেলিফোন ও সরকারি গাড়ি (ড্রাইভার ও ফুয়েল) এবং উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ আবাসিক টেলিফোন ইত্যাদি অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকেন।

এক্ষেত্রে মাসিক আয় হিসাব করার সময় এসব অতিরিক্ত সুবিধাদি টাকায় রূপান্তরিত করে স্পাউজের আয় ও অন্যান্য উৎস থেকে আয়সহ মাসিক বেতনের সাথে যোগ করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে উত্তরদাতাগণকে পাঁচটি আয় দলে ভাগ করা হয়েছে, যেমন নিম্নবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ৭০০০-৯৯৯৯ পর্যন্ত; নিম্ন মধ্যবিত্ত-যাদের মাসিক আয় ১০,০০০-১৪,৯৯৯ পর্যন্ত; মধ্য মধ্যবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ১৫,০০০-২৪,৯৯৯ পর্যন্ত; উচ্চ মধ্যবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ২৫,০০০-৪৯,৯৯৯ পর্যন্ত; এবং উচ্চবিত্ত- যাদের মাসিক আয় টাকা ৫০,০০০ এর উর্ধ্বে। সংগৃহীত উপাত্ত সাধারণ পরিসংখ্যানীয় পদ্ধতিতে (গড়, শতকরা হার) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ ও ফলাফল

গবেষণায় অতিরিক্ত সচিব থেকে সহকারি সচিব পদমর্যাদার ১৩১জন কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে সিনিয়র সহকারি সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার সংখ্যা সর্বাধিক (৪২.৭৫%)। বয়সের বিবেচনায় কর্মকর্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বয়স ৪০-৪৯ বছর (৬২.৬%) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তার বয়স ৩০-৩৯ বছর (২৬.৭২%)। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের চার-পঞ্চমাংশের অধিক পুরুষ এবং প্রায় সবাই বিবাহিত (৯৬.১৮%)। পদমর্যাদা অনুযায়ী সহকারি সচিব পদমর্যাদার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৬.৬৭%) কর্মকর্তা অবিবাহিত। শিক্ষাগত ক্ষেত্রে প্রায় সবাই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী (৯৫.৪২%) এবং অবশিষ্ট সংখ্যক স্নাতক।

পরিবারের আয়তনের বিবেচনায় অধিকাংশ কর্মকর্তা (৫৮.৫৮%) ছোট পরিবার অর্থাৎ ১-৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত হলেও এক-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা ৫-৬ সদস্য বিশিষ্ট বড় পরিবারভুক্ত। পদমর্যাদার বিবেচনায় অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার অধিকাংশ কর্মকর্তা এবং সিনিয়র সহকারি সচিব পদমর্যাদার প্রায় অর্ধেক বড় পরিবারভুক্ত। কর্মকর্তাদের অধিকাংশ সরকারি আবাসন সুবিধা পেয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা (২৯.৭৭%) ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। পদমর্যাদার বিবেচনায় সিনিয়র সহকারি সচিব পদমর্যাদার এক-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা এবং সহকারি সচিব পদমর্যাদার

চার-পঞ্চমাংশ কর্মকর্তা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। কর্মকর্তাদের অধিকাংশই নিজেরা তাদের স্বাস্থ্যকে 'অতিউত্তম(এ)' শ্রেণীভুক্ত করলেও প্রায় অর্ধেক কর্মকর্তাই বিভিন্ন রোগ বিশেষতঃ ডায়াবেটিক (৪৩.৩১%) ও উচ্চ রক্ত চাপে (৪৩.৩১%) আক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এসব রোগ তাদের অবসর আচরণের উপর কোন প্রভাব ফেলছে না।

সারণী ২। কর্মকর্তাদের মাসিক আয়ের বিন্যাস (টাকা)

পদ মার্যাদা	আয় দল					মোট
	নিম্নবিত্ত (৭,০০০-৯,৯৯৯)	নিম্ন মধ্যবিত্ত (১০,০০০-১৪,৯৯৯)	মধ্য মধ্যবিত্ত (১৫,০০০-২৪,৯৯৯)	উচ্চ মধ্যবিত্ত (২৫,০০০-৪৯,৯৯৯)	উচ্চবিত্ত (৫০,০০০ ও তদূর্ধ্ব	
অতিরিক্ত সচিব ও সমমান	–	–	–	২ (৬৬.৬৭)	১ (৩৩.৩৩)	৩
যুগ্ম-সচিব ও সমমান	–	–		১২ ((৬৬.৬৭)	৬ (৩৩.৩৩)	১৮
উপ-সচিব ও সমমান	–	–	১৭ (৪৩.৬০)	১৮ (৪৬.১৫)	৪ (১০.২৫)	৩৯
সিনিয়র সহকারি সচিব ও সমমান	–	১২ (২১.৪৩)	৩১ (৫৫.৩৬)	৯ (১৬.০৭)	৪ (৭.১৪)	৫৬
সহকারি সচিব ও সমমান	১ (৬.৬৭)	৯ (৬০.০)	৩ (২০.০)	২ (১৩.৩৩)	–	১৫
মোট	১ (০.৭৬)	২১ (১৬.০৩)	৫১ (৩৮.৯৩)	৪৩ (৩২.৮২)	১৫ (১১.৪৫)	১৩১

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

আয়ের বিন্যাস

এক-তৃতীয়াংশের অধিক কর্মকর্তার স্পাউজ স্বীকৃত অর্থনৈতিক পেশায় (formal economic occupation) জড়িত। মাসিক আয়ের বিন্যাস অনুযায়ী (সারণী ২) মধ্য মধ্যবিত্ত (টাকা ১৫,০০০-২৪,৯৯৯) কর্মকর্তার সংখ্যা বেশী এবং এক-দশমাংশের বেশি কর্মকর্তা উচ্চবিত্তের (টাকা ৫০,০০০ ও তদুর্ধ্ব) অধিকারী। উচ্চ মধ্যবিত্ত (টাকা ২৫,০০০-৪৯,৯৯৯) কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যা দ্বিতীয় সর্বাধিক। নিম্ন মধ্যবিত্ত (টাকা ১০,০০০-১৪,৯৯৯)

কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ এবং নিম্নবিত্ত (টাকা ৭,০০০-৯,৯৯৯) কর্মকর্তার সংখ্যা নেই বললেই চলে (০.৭৬%)। পদ মর্যাদার বিবেচনায় অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম-সচিব উভয়ের ক্ষেত্রেই দুই-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং উভয় ক্ষেত্রেই এক-তৃতীয়াশ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আওতাধীন। উপ-সচিবদের ক্ষেত্রে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য রয়েছে এবং এদের কেউই নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়। সিনিয়র সহকারি সচিবদের অধিকাংশ মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং কেউই নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়। অন্যদিকে সহকারি সচিবদের অধিকাংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং কেউই উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়।

সারণী ৩। অবসর সম্পর্কে কমকর্তাদের ধারণা

অবসর সম্পর্কে ধারণা	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
ক) চাকরি বা কোন ধরনের কাজকর্ম ছেড়ে থাকা;	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৫৫.৫৫)	১৯ (৪৮.৭২)	১৫ (২৬.৭৮)	৫ (৩৩.৩৩)	৫১ (৩৮.৯৩)
খ) কাজ, ঘুম এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালির দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট সময় হচ্ছে অবসর;	২ (৬৬.৬৭)	৮ (৪৪.৪৪)	২০ (৫১.২৮)	১৭ (৩০.৩৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৫৫ (৪১.৯৮)
গ) জীবন-জীবিকা ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজের শেষে যে অবশিষ্ট সময় স্বেচ্ছায় আনন্দের জন্য ব্যয় করা হয় তাই অবসর;	৩ (১০০.০)	১২ (৬৬.৬৭)	২৩ (৫৮.৯৭)	৩৫ (৬২.৫)	১১ (৭৩.৩৩)	৮৪ (৬৪.১২)
ঘ) কাজ করা বা না করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত সময়;	৩ (১০০.০)	১২ (৬৭.৬৭)	১৮ (৪৬.১৫)	১৩ (২৩.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৫১ (৩৮.৯৩)
ঙ) কাজ ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত যে সময় বিনোদনের জন্য জন্য ব্যয় করা হয়;	–	১৩ (৭২.২২)	২২ (৫৬.৪১)	২৭ (৪৮.২১)	৮ (৫৩.৩৩)	৭০ (৫৩.৪৩)

সূত্রঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

অবসর ও বিনোদন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের ধারণা

কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে জীবন-জীবিকা ও জীবনের পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজের শেষে যে অবশিষ্ট সময় স্বেচ্ছায় আনন্দের জন্য ব্যয় করা হয় তাই অবসর (সারণী ৩)। অর্ধেকের বেশি সংখ্যক কর্মকর্তার সমর্থন অনুযায়ী অবসর হচ্ছে কাজ ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত সময় যা বিনোদনের জন্য ব্যয় করা হয়। এছাড়া কাজ, ঘুম এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালির দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট সময় হচ্ছে অবসর- এই ধারণাটিও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা বিবেচনা করেছেন। লিঙ্গ ও আয় ভেদেও কর্মকর্তাগণ অবসর সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। অবসর সম্পর্কে কর্মকর্তাদের এই ধারণা উন্নত বিশ্ব ও বাংলাদেশের বিনোদন গবেষক দ্বারা সমর্থিত হয় (Brightbill, 1960; Bucher and Bucher, 1974; Hendon, 1981; Johnston, Gregory and Smith, 1986; Boniface and Cooper, 1990; Haque, 1995)।

কর্মকর্তাদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি অংশের মতে বিনোদন হচ্ছে সেই সব কাজ যেগুলো দেহমনকে সজীব ও প্রফুল্ল করে (সারণী ৪)। বিনোদন সম্পর্কিত এই ধারণা বিনোদনের শারীরিক ও মানসিক গুরুত্বকে সমর্থন করে (Leitner et. al. 1989 : 14)। অন্য যে দুটি ধারণাকে অর্ধেকের বেশি কর্মকর্তা সমর্থন করেছেন সেগুলো হচ্ছে- অবসর সময়ে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কাজ যা মূলতঃ ব্যক্তির কর্মশক্তি ও মননের নবায়ন ঘটায়; এবং বিনোদন হচ্ছে অবসর সময়ে গৃহীত সৃজনশীল ও পুনঃসৃজনশীল কাজ যার মাধ্যমে মানুষ সৃজনশীল, সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। লিঙ্গ ও আয় ভেদেও কর্মকর্তাগণ বিনোদন সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। এ থেকে উন্নত বিশ্ব ও বাংলাদেশের বিনোদন গবেষকদের (Vannier, 1977; Clawson & Knetch, 1966; Boniface, et al., 1990; Seeley, 1973; Haque 1995) বিনোদন সম্পর্কিত ধারণার পক্ষে কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

সারণী ৪। অবসর সম্পর্কে কমকর্তাদের ধারণা

অবসর সম্পর্কে ধারণা	কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সম্মান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
ক) অবসর সময়ে সংঘটিত কর্মকান্ড হচ্ছে বিনোদন	১ (৩৩.৩৩)	১১ (৬১.১১)	১৯ (৪৮.৭২)	১৩ (২৩.২১)	৬ (৪০.০)	৫০ (৩৮.১৭)
খ)বিনোদন হচ্ছে সেই সব কাজ যেগুলো দেহ মনকে সজীব ও প্রফুল্ল করে;	৩ (১০০.০)	১৫ (৮৩.৩৩)	২৬ (৬৬.৬৭)	৪২ (৭৫.০)	১২ (৮০.০)	৯৮ (৭৮.৮১)
গ) বিনোদন হচ্ছে অবসর সময়ে গৃহীত সৃজনশীল ও পুনঃসৃজনশীল কাজ যার মাধ্যমে মানুষ সৃজনশীল, সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে;	২ (৬৬.৬৭)	১৩ (৭২.২২)	২৫ (৬৪.১)	২৩ (৪১.০৭)	৬ (৪০.০)	৬৯ (৫২.৬৭)
ঘ) বিনোদন মূলতঃ দৈনন্দিন ও প্রয়োজনীয় কাজের নবয়ান বা প্রস্তুতি বা কাজ থেকে মুক্তির একটি উপায়;	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৫৫.৫৬)	১৭ (৪৩.৫৯)	৮ (১৪.২৯)	৬ (৪০.০)	৪৩ (৩২.৮২)
ঙ) অবসর সময়ে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কাজ যা মূলতঃ ব্যক্তির কর্মশক্তি ও মননের নবায়ন ঘটায়;	২ (৬৬.৬৭)	১২ (৬৬.৬৭)	২৫ (৬৪.১)	২৮ (৫০.০)	৬ (৪০.০)	৭৩ (৫৫.৭৩)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণায় কর্মকর্তাগণের প্রায় সকলেই অবসরকে জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অবসরের অভাবে মানুষের কর্মস্পৃহা কমে যায় এবং জীবন একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এছাড়া অবসরের অনুপস্থিতি মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশকে ব্যাহত করে, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং মানুষের জীবনে অস্থিরতা বেড়ে যায়।

অন্তঃকক্ষ বিনোদন

অন্তঃকক্ষ বিনোদনের অংশ হিসেবে অধিকাংশ কর্মকর্তাই খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/বই পড়েন এবং টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখেন (সারণী ৫)। এছাড়া পরিবারের সাথে সময় কাটানো, টিভির স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা, গান শোনা, তাস খেলা এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন হিসেবে গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। দাবা খেলা ও ঘরে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃকক্ষ বিনোদন। তবে ছবি আঁকা ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ উপেক্ষিত হয়েছে। সামান্য ব্যতিক্রম বাদে, পদমর্যাদা, আয় (নিম্নবিত্ত ছাড়া) ও স্বাস্থ্যভেদে কর্মকর্তাদের মধ্যে একই ধরনের অন্তঃকক্ষ বিনোদনে অংশগ্রণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন যেমন পরিবারের সাথে সময় কাটানো, টিভির স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা, গান শোনা তাস খেলা এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো নিম্নবিত্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

নারী-পুরুষ বিবেচনায় মহিলা কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন হলো গান শোনা, রান্না করা এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়ানো। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য অন্তঃকক্ষ বিনোদন হলো টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা, তাস খেলা, দাবা খেলা ও খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/বই পড়া। বয়সের বিবেচনায় ৫৫-৫৯ বছর বয়সী কোন কর্মকর্তাই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, দাবা খেলা, গান শোনা ও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যান না।

বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় অবিবাহিত কর্মকর্তাগণ আড্ডা দিতে,তাস ও দাবা খেলতে এবং গান শুনতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিত কর্মকর্তাগণ পরিবারের সাথে সময় কাটাতে, টিভিতে ক্রিকেট খেলা

সারণী ৫। পদমর্যাদা অনুসারে কর্মকর্তাদের অন্তঃকক্ষ বিনোদন

অন্তঃকক্ষ বিনোদন	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট (N=১৩১
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	
১. ঘরে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া	–	৪ (২২.২২)	১৫ (৩৮.৪৬)	২৩ (৪১.০৭)	১০ (৬৬.৬৭)	৫২ (৩৯.৭)
২. তাস খেলা	৩ (১০০.০)	১৫ (৮৩.৩৩)	২৫ (৬৪.১)	১৮ (৩২.১৪)	৬ (৪০.০)	৬৭ (৫১.১৪)
৩. দাব খেলা	৩ (১০০.০)	১৩ (৭২.২২)	২৩ (৫৮.৯৪)	১৩ (২৩.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৫৭ (৪৩.৫১)
৪. খবরের কাগজ/ ম্যাগাজিন পড়া/ বই পড়া	৩ (১০০.০)	১৮ (১০০.০)	৩৫ (৮৯.৭৪)	৪৫ (৮০.৩৬)	১২ (৮০.০)	১১৩ (৮৬.২৬)
৫. পরিবারের সাথে সময় কাটানো	৩ (১০০.০)	১২ (৬৬.৬৭)	২৭ (৬৯.২৩)	৩৯ (৬৯.৬৪)	৮ (৫৩.৩৩)	৮৯ (৬৭.৯৪)
৬. টিভি/স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা	–	১২ (৬৬.৬৭)	২৬ (৬৬.৬৭)	৩৮ (৬৭.৮৬)	১০ (৬৬.৬৭)	৮৬ (৬৫.৬৫)
৭. রেডিও শোনা	–	–	৩ (৭.৭)	৬ (১০.৭১)	২ (১৩.৩৩)	১১ (৮.৪)
৮. গান শোনা	–	৬ (৩৩.৩৩)	১৭ (৪৩.৫৯)	৩৫ (৬২.৫)	১১ (৭৩.৩৩)	৬৯ (৫২.৬৭)
৯. ঘুমানো	১ (৩৩.৩৩)	–	৯ (২৩.০৭)	১৬ (২৮.৫৭)	৪ (২৬.৬৭)	৩০ (২২.৯)
১০. মঞ্চ নাটক দেখা	–	১ (৫.৫৫)	৪ (১০.২৫)	১২ (২১.৪৯)	৩ (২০.০)	২০ (১৫.২৬)
১১. রেস্তোরায় খাওয়া	–	–	৩ (৭.৭)	৩ (৫.৩৬)	১ (৬.৬৭)	৭ (১৫.৩৪)
১২. আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়ানো	১ (৩৩.৩৩)	১০ (৫৫.৫৫)	২৩ (৫৮.৯৭)	২৭ (৪৮.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৬৬ (৫০.৩৮)
১৩. অভিনয় করা	–	–	১ (২.৫৬)	১ (১.৭৮)	–	২ (১.৫৩)
১৪. লেখালেখি করা	১ (৩৩.৩৩)	৩ (১৬.৬৭)	২ (৫.১৩)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৪ (১০.৬৮)
১৫. ছবি তোলা	–	৫ (২৭.৭৮)	৬ (১৫.৩৮)	১ (১.৭৮)	১ (৬.৬৭)	১৩ (৯.৯২)
১৬. ছবি আঁকা	–	–	২ (৫.১৩)	১ (১.৭৮)	–	৩ (২.৩)
১৭. জুয়া খেলা/ মদ্যপান/ নেশা করা	৩ (১০০.০)	৬ (৩৩.৩৩)	৫ (১২.৮২)	৪ (৭.১৪)	১ (৬.৬৭)	১৯ (১৪.৫)
১৮. রান্না করা	–	–	১ (২.৫৬)	৯ (১৬.০৭)	৩ (২০.০)	১৩ (৯.৯২)
১৯. টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা	৩ (১০০.০)	১৬ (৮৮.৮৯)	৩১ (৭৯.৪৮)	৩৮ (৬৭.৮৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৯৬ (৭৩.২৮)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী ৫। পদমর্যাদা অনুসারে কর্মকর্তাদের অন্তঃকক্ষ বিনোদন

অন্তঃকক্ষ বিনোদন	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট (N=১৩১)
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	
১. ঘরে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া	–	৪ (২২.২২)	১৫ (৩৮.৪৬)	২৩ (৪১.০৭)	১০ (৬৬.৬৭)	৫২ (৩৯.৭)
২. তাস খেলা	৩ (১০০.০)	১৫ (৮৩.৩৩)	২৫ (৬৪.১)	১৮ (৩২.১৪)	৬ (৪০.০)	৬৭ (৫১.১৪)
৩. দাব খেলা	৩ (১০০.০)	১৩ (৭২.২২)	২৩ (৫৮.৯৪)	১৩ (২৩.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৫৭ (৪৩.৫১)
৪. খবরের কাগজ/ ম্যাগাজিন পড়া/ বই পড়া	৩ (১০০.০)	১৮ (১০০.০)	৩৫ (৮৯.৭৪)	৪৫ (৮০.৩৬)	১২ (৮০.০)	১১৩ (৮৬.২৬)
৫. পরিবারের সাথে সময় কাটানো	৩ (১০০.০)	১২ (৬৬.৬৭)	২৭ (৬৯.২৩)	৩৯ (৬৯.৬৪)	৮ (৫৩.৩৩)	৮৯ (৬৭.৯৪)
৬. টিভি/স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা	–	১২ (৬৬.৬৭)	২৬ (৬৬.৬৭)	৩৮ (৬৭.৮৬)	১০ (৬৬.৬৭)	৮৬ (৬৫.৬৫)
৭. রেডিও শোনা	–	–	৩ (৭.৭)	৬ (১০.৭১)	২ (১৩.৩৩)	১১ (৮.৪)
৮. গান শোনা	–	৬ (৩৩.৩৩)	১৭ (৪৩.৫৯)	৩৫ (৬২.৫)	১১ (৭৩.৩৩)	৬৯ (৫২.৬৭)
৯. ঘুমানো	১ (৩৩.৩৩)	–	৯ (২৩.০৭)	১৬ (২৮.৫৭)	৪ (২৬.৬৭)	৩০ (২২.৯)
১০. মঞ্চ নাটক দেখা	–	১ (৫.৫৫)	৪ (১০.২৫)	১২ (২১.৪৯)	৩ (২০.০)	২০ (১৫.২৬)
১১. রেঁস্তোরায় খাওয়া	–	–	৩ (৭.৭)	৩ (৫.৩৬)	১ (৬.৬৭)	৭ (১৫.৩৪)
১২. আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়ানো	১ (৩৩.৩৩)	১০ (৫৫.৫৫)	২৩ (৫৮.৯৭)	২৭ (৪৮.২১)	৫ (৩৩.৩৩)	৬৬ (৫০.৩৮)
১৩. অভিনয় করা	–	–	১ (২.৫৬)	১ (১.৭৮)	–	২ (১.৫৩)
১৪. লেখালেখি করা	১ (৩৩.৩৩)	৩ (১৬.৬৭)	২ (৫.১৩)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৪ (১০.৬৮)
১৫. ছবি তোলা	–	৫ (২৭.৭৮)	৬ (১৫.৩৮)	১ (১.৭৮)	১ (৬.৬৭)	১৩ (৯.৯২)
১৬. ছবি আঁকা	–	–	২ (৫.১৩)	১ (১.৭৮)	–	৩ (২.৩)
১৭. জুয়া খেলা/ মদ্যপান/ নেশা করা	৩ (১০০.০)	৬ (৩৩.৩৩)	৫ (১২.৮২)	৪ (৭.১৪)	১ (৬.৬৭)	১৯ (১৪.৫)
১৮. রান্না করা	–	–	১ (২.৫৬)	৯ (১৬.০৭)	৩ (২০.০)	১৩ (৯.৯২)
১৯. টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা	৩ (১০০.০)	১৬ (৮৮.৮৯)	৩১ (৭৯.৪৮)	৩৮ (৬৭.৮৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৯৬ (৭৩.২৮)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী ৬। পদমর্যাদা অনুসারে কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদন

বহিরাঙ্গন বিনোদন	কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
১. পার্কে যাওয়া	–	৩ (১৬.৬৭)	১৫ (৩৮.৪৬)	২৪ (৪২.৮৬)	৮ (৫৩.৩৩)	৫০ (৩৮.১৬)
২. মেলায়/ চিড়িয়াখানায় যাওয়া	–	–	৫ (১২.৮২)	১৮ (৩২.১৪)	৫ (৩৩.৩৩)	২৮ (২১.৩)
৩. লন টেনিস ব্যাডমিন্টন খেলা	২ (৬৬.৬৭)	১১ (৬১.১১)	১৪ (৩৫.৯)	৮ (১৪.২৮)	৩ (২০.০)	৩৮ (২৯.০)
৪. স্টেডিয়ামে খেলা দেখা	–	১ (৫.৫৫)	–	৬ (১০.৭১)	৪ (২৬.৬৭)	১১ (৮.৪)
৫. দীর্ঘ হাঁটা	২ (৬৬.৬৭)	১৩ (৭২.২২)	২৯ (৭৪.৩৬)	১৭ (৩০.৩৬)	৪ (২৬.৬৭)	৬৫ (৪৯.৬২)
৬.গাড়ীতে দীর্ঘ ভ্রমণ	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৫৫.৫৫)	১০ (২৫.৬৪)	৯ (১৬.০৭)	৪ (২৬.৬৭)	৩৫ (২৬.৭২)
৭. ছবি তোলা	–	৪ (২২.২২)	৩ (৭.৭)	৫ (৮.৯৩)	২ (১৩.৩৩)	১৪ (১০.৬৯)
৮. বড়শীতে মাছ ধরা	–	–	৪ (১০.২৫)	৪ (৭.১৪)	–	৮ (৬.১)
৯. ধর্মীয় কাজে অংশ নেয়া	–	৯ (৫০.০)	২২ (৫৬.৪১)	২৩ (৪১.০৭)	৩ (২০.০)	৫৭ (৪৩.৫১)
১০. বাগান করা	–	৩ (১৬.৬৭)	৫ (১২.৮২)	১৩ (২৩.২১)	১ (৬.৬৭)	২২ (১৬.৮)
১১. দোকানে কেনাকাটা	–	১ (৫.৫৫)	১ (২.৫৬)	৮ (১৪.২৮)	–	১০ (৭.৬৩)
১২. স্ত্রী/স্বামীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো	–	৬ (৩৩.৩৩)	২৩ (৫৮.৯৭)	২৫ (৪৪.৬৪)	৬ (৪০.০)	৬০ (৪৫.৮)
১৩.সপরিবারে ঘুরে বোড়ানো	৩ (১০০.০)	১'৩ (৭২.২২)	২৫ (৬৪.১)	৩৪ (৬০.৭১)	৭ (৪৬.৬৭)	৮২ (৬২.৬)
১৪. ব্যায়াম/ জগিং করা	–	৬ (৩৩.৩৩)	৮ (২০.৫১)	৭ (১২.৫)	২ (১৩.৩৩)	২৩ (১৭.৫৬)
১৫. সমাজ সেবা	৩ (১০০.০)	৯ (৫০.০)	২০ (৫১.২৮)	২৩ (৪১.০৭)	৫ (৩৩.৩৩)	৬০ (৪৫.৮)
১৬. সাঁতার কাটা	–	১ (৫.৫৫)	৩ (৭.৭)	১ (১.৭৮)	১ (৬.৬৭)	৬ (৪.৫৮)
১৭. ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন	৩ (১০০.০)	১৪ (৭৭.৭৮)	২৮ (৭১.৮)	৩৬ (৬৪.২৮)	১০ (৬৬.৬৭)	৯১ (৬৯.৪৬)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

দেখতে ও স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখতে বেশি পছন্দ করেন। পরিবারের আয়তন বিবেচনায় ১১-১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের কর্মকর্তাগণ কেবল খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/বই পড়তে, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে ও লেখালেখি করতে পছন্দ করেন। যে সব কর্মকর্তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭-৮ জন তাদের প্রধান অন্তঃকক্ষ বিনোদন হচ্ছে তাস খেলা, খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন/বই পড়া, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, স্যাটেলাইট চ্যানেলে ছবি দেখা, লেখালেখি ও টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা।

বহিরাঙ্গন বিনোদন

কর্মকর্তাদের দুটি প্রধান বহিরাঙ্গন বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ও সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বহিরাঙ্গন বিনোদন হচ্ছে দীর্ঘ হাঁটা, স্পাউজসহ ঘুরে বেড়ানো, সমাজ সেবা, ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং পার্কে যাওয়া। শারিরীক আয়াসযুক্ত বিনোদন যেমন টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা, ব্যায়াম/জগিং, বাগান করা ও সাঁতার কম গুরুত্ব পেয়েছে। সামান্য ব্যতিক্রম বাদে পদমর্যাদা নির্বিশেষে কর্মকর্তাদের একই ধরনের বিনোদনে অংশগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণী৬)। অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো, সমাজ সেবা, দীর্ঘ হাঁটা, টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা ও গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণ ইত্যাদি বিনোদনে অংশগ্রহণের ঝোঁক বেশী। নারী-পুরুষ বিবেচনায় মহিলা কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন হচ্ছে পার্কে যাওয়া, স্পাউজের সাথে ঘুরে বেড়ানো, গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণ ও মেলায়/চিড়িয়াখানায় যাওয়া। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, দীর্ঘ হাঁটা, সমাজ সেবা ও টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা। বয়সভেদে (সারণী ৭) বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণ বিবেচনায় দেখা যায় যে, বাগান করা ও দোকানে কেনাকাটায় ৫৫-৫৯ বছর বয়সী কর্মকর্তাগণের প্রাধান্য বেশি। পার্কে যাওয়ার ক্ষেত্রে ৩০-৩৪ ও ৪০-৪৪ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের প্রাধান্য বেশি। দীর্ঘ হাঁটা হচ্ছে ৪০-৫৯ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের প্রধান বহিরাঙ্গন বিনোদন এবং ব্যায়ম/জগিং এর ক্ষেত্রে ৪০-৪৫ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের প্রাধান্য বেশী। কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের বয়স ৩৫-৩৯ ও ৫০-৫৯ বছর তাদের কেউই বহিরাঙ্গন বিনোদন হিসেবে সাঁতারকে পছন্দ করেননি

সারণী ৭। বয়সভেদে কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদন

বহিরাঙ্গন বিনোদন	বয়স						মোট
	৩০-৩৪ (n=১১)	৩৫-৩৯ (n=২৪)	৪০-৪৪ (n=৪২)	৪৫-৪৯ (n=৪০)	৫০-৫৪ (n=১১)	৫৫-৫৯ (n=৩)	(N=১৩১)
১. পার্কে যাওয়া	৮ (৭২.৭৩)	৮ (৩৩.৩৩)	২২ (৫২.৩৮)	১১ (২৭.৫)	১ (৯.০৯)	–	৫০ (৩৮.১৬)
২. মেলায়/ চিড়িয়াখানায় যাওয়া	৪ (৩৬.৩৬)	১২ ৫০.০)	৭ (১৬.৬৭)	৫ (১২.৫)	–	–	২৮ (২১.৩৭)
৩. লন টেনিস/ ব্যাডমিন্টন খেলা	৩ (২৭.২৭)	৩ (১২.৫)	১১ (২৬.২)	১৬ (৪০.০)	৫ (৪৫.৪৫)	–	৩৮ (২৯.০)
৪. স্টেডিয়ামে খেলা দেখা	৩ (২৭.২৭)	১ (৪.১৭)	৫ (১১.৯)	২ (৫.০)	–	–	১১ (৮.৪)
৫. দীর্ঘ হাঁটা	১ (৯.০৯)	৭ (২৯.১৭)	২০ (৪৭.৬২)	২৮ (৭০.০)	৭ (৬৩.৬৪)	২ (৬৬.৬৭)	৬৫ (৪৯.৬২)
৬. গাড়ীতে দীর্ঘ ভ্রমণ	২ (১৮.১৮)	৬ (২৫.০)	১০ (২৩.৮১)	১২ (৩০.০)	৫ (৪৫.৪৫)	–	৩৫ (২৬.৭২)
৭. ছবি তোলা	–	৩ (১২.৫)	৪ (৯.৫২)	৬ (১৫.০)	১ (৯.০৯)	–	১৪ (১০.৬৯)
৮. বড়শীতে মাছ ধরা	–	–	৬ (১৪.২৮)	২ (৫.০)	–	–	৮ (৬.১)
৯. ধর্মীয় কাজে অংশ নেয়া	৩ (২৭.২৭)	৬ (২৫.০)	২১ (৫০.০)	২৩ (৫৭.৫)	৪ (৩৬.৩৬)	–	৫৭ (৪৩.৫১)
১০. বাগান করা	১ (৯.০৯)	২ (৮.৩৩)	৯ (২১.৪৩)	৭ (১৭.৫)	১ (৯.০৯)	২ (৬৬.৬৭)	২২ (১৬.৮)
১১. দোকানে কেনাকাটা	–	৩ (১২.৫)	৩ (৭.১৪)	২ (৫.০)	–	২ (৬৬.৬৭)	১০ (৭.৬৩)
১২. স্ত্রী/স্বামীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো	৩ (২৭.২৭)	১৩ (৫৪.১৭)	২১ (৫০.০)	২১ (৫২.৫)	২ (১৮.১৮)	–	৬০ (৪৫.৮)
১৩. সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো	৫ (৪৫.৪৫)	১৪ (৫৮.৩৩)	২৮ (৬৬.৬৭)	২৭ (৬৭.৫)	৬ (৫৪.৫৪)	২ (৬৬.৬৭)	৮২ (৬২.৬)
১৪. ব্যায়াম/ জগিং করা	২ (১৮.১৮)	২ (৮.৩৩)	৪ (৯.৫২)	১৩ (৩২.৫)	২ (১৮.১৮)	–	২৩ (১৭.৫৬)
১৫. সমাজ সেবা	৪ (৩৬.৩৬)	৫ (২৮.৮৩)	২১ (৫০.০)	২৪ (৬০.০)	৪ (৩৬.৩৬)	২ (৬৬.৬৭)	৬০ (৪৫.৮)
১৬. সাঁতার কাটা	১ (৯.০৯)	–	২ (৪.৭৬)	৩ (৭.৫)	–	–	৬ (৪.৫৮)
১৭. দর্শনীয় স্থান দেখা	৭ (৬৩.৬৪)	১৫ (৬২.৫)	৩৩ (৭৮.৫৭)	২৬ (৬৫.০)	৮ (৭২.৭৩)	২ (৬৬.৬৭)	৯১ (৬৯.৪৬)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

এবং ৩০-৩৪ ও ৪০-৪৯ বছর বয়সী কর্মকর্তাদের মধ্যে এটি প্রায় উপেক্ষিত। বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় অবিবাহিত কর্মকর্তাগণ পার্কে যাওয়া, ষ্টেডিয়ামে খেলা দেখা, টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা ও সমাজ সেবাকে বহিরাঙ্গন বিনোদন হিসেবে নির্বাচন করেছেন। মেলায়/চিড়িয়াখানায় যাওয়া, গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণ, ছবি তোলা, বড়শিতে মাছ ধরা, বাগান করা ও দোকানে কেনাকাটা অবিবাহিত কর্মকর্তাগণ সম্পূর্ণভাবে উপক্ষো করেছেন। অন্যদিকে বিবাহিত কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন হচ্ছে সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো, দীর্ঘ হাঁটা ও ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ। পরিবারের আয়তন বিবেচনায় ১১-১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের কর্মকর্তাদের মাত্র দু ধরনের বহিরাঙ্গন বিনোদন-স্পাউজসহ ঘুরে বেড়ানো ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন। পরিবারের আয়তন বাড়ার সাথে সাথে পার্কে যাওয়ার গুরুত্ব একদিকে যেমন কমে তেমনি অন্যদিকে ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ বেড়ে যায়। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ১-২ সদস্য বিশিষ্ট, ৩-৪ সদস্য বিশিষ্ট ও ৫-৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আয়ভেদে কর্মকর্তাদের বহিরাঙ্গন বিনোদন বিবেচনায় দেখা যায় যে, নিম্নবিত্ত কর্মকর্তাগণ শুধু টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা, ষ্টেডিয়ামে খেলা দেখা, দীর্ঘ হাঁটা, ব্যায়াম/জগিং ও সাঁতারে অংশ নেন। এ ছাড়া আয়ভেদেও কর্মকর্তাদের মধ্যে বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

আয়াসযুক্ত বহিরাঙ্গন বিনোদন যেমন সাঁতার, ব্যায়াম/জগিং ও দীর্ঘ হাঁটা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মাঝারি স্বাস্থ্যের (সি শ্রেণী) অধিকারী কর্মকর্তাগণ প্রধানতঃ স্পাউজ ও পরিবারসহ ঘুরে বেড়ান। ভাল স্বাস্থ্যের (বি শ্রেণী) অধিকারী কর্মকর্তাগণের প্রধান বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, স্পাউজ ও পরিবারসহ ঘুরে বেড়ানো। চমৎকার স্বাস্থ্যের (এ শ্রেণী) অধিকারী কর্মকর্তাগণের প্রধান বিনোদন হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, পরিবারসহ ঘুরে বেড়ানো, দীর্ঘ হাঁটা,সমাজ সেবা ও ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ।

নির্বাচিত বিনোদন স্থান ও ক্লাবের বিনোদন

বাড়ি কর্মকর্তাদের প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (সারণী ৮)। অন্য তিনটি উল্লেখযোগ্য বিনোদন স্থান হচ্ছে পার্ক, ক্লাব ওগ্রন্থাগার। পদমর্যাদা

অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিবদের কাছে বাড়ি, ক্লাব ও গ্রন্থাগার বিনোদন স্থান হিসেবে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারি সচিব ও সহকারি সচিবদের তুলনায় যুগ্ম-সচিবদের কাছে ক্লাব অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিবদের কাছে পার্ক ও গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নারী-পুরুষ বিবেচনায় পুরুষ কর্মকর্তাদের তুলনায় মহিলা কর্মকর্তাদের কাছে বাড়ি ও পার্ক বিনোদন স্থান হিসেবে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। মহিলা কর্মকর্তাদের কেউই ক্লাব ও ষ্টেডিয়ামকে বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেননি।

সারণী ৮। কর্মকর্তাদের নির্বাচিত বিনোদন স্থান

পদমর্যাদা	বিনোদনের স্থান					
	বাড়ি	পার্ক	নদীর তীর	ষ্টেডিয়াম	ক্লাব	গ্রন্থাগার
অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	৩ (১০০.০০)	১ (৩৩.৩৩)	–	–	৩ (১০০.০০)	৩ (১০০.০০)
যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	১৮ (১০০.০০)	১১ (৬১.১১)	২ (১১.১১)	১ (৫৫.৫৫)	১৪ (৭৭.৭৮)	১১ (৬১.১১)
উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	৩৭ (৯৪.৮৭)	২৪ (৬১.৫৪)	৮ (২০.৫১)	৪ (১০.২৬)	২২ (৫৬.৪১)	২৬ (৬৬.৬৬)
সিনিয়র সহকারী সচিবা সমমান (n=৫৬)	৪৯ (৮৭.৫)	৩০ (৫৩.৫৭)	৮ (১৪.২৮)	৪ (৭.১৪)	২৬ (৪৬.৪৩)	২১ (৩৭.৫)
সহকারী সচিব বা সমমান (n =১৫)	১২ (৮০.০)	১২ (৮০.০)	৫ (৩৩.৩৩)	২ (১৩.৩৩)	৭ (৪৬.৬৬)	৭ (৪৬.৬৬)
মোট (N=১৩১)	১১৯ (৯০.৮৪)	৭৮ (৫৯.৫৪)	২৩ (১৭.৫৬)	১১ (৮.৪০)	৭২ (৫৪.৯৬)	৬৮ (৫১.৯১)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মকর্তাদের মাসিক বিনোদন ব্যয় টাকা <৫০০ হতে টাকা ৮০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গবেষণাধীন কর্মকর্তাদের এক-তৃতীয়াংশের মাসিক বিনোদন ব্যয় টাকা ১০০০এর বেশি নয়। এক-চতুর্থাংশ কর্মকর্তার এ-খাতে ব্যয় টাকা ২০০০-৩০০০ এবং এক-দশমাংশের অধিক কর্মকর্তা এ খাতে মাসে টাকা ৩০০০-৪০০০ ব্যয় করেন। পদমর্যাদার হিসেবে সহকারি সচিবদের মাসিক বিনোদন

ব্যয় টাকা<৫০০ হতে টাকা ৩০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অতিরিক্ত সচিবদের ক্ষেত্রেও এই ব্যয় টকা ৫০০ হতে টাকা ৩০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিবদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে মাসিক বিনোদন ব্যয় যথাক্রমে টাকা ১৫০০ হতে টাকা ৪০০০ এবং টাকা ১০০০ হতে টাকা ৩০০০। সিনিয়র সহকারি সচিবদের অধিকাংশের মাসিক বিনোদন ব্যয় টাকা ১০০০ পর্যন্ত সীমিত এবং এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাসে টাকা ১০০০-টাকা ৩০০০ বিনোদন খাতে ব্যয় করেন। বিনোদন খাতে গবেষণাধীন কর্মকর্তাদের মাসিক গড় ব্যয় হচ্ছে টাকা ১৮৭৭.০৯। পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ব্যয়ও বাড়ে। অতিরিক্ত সচিবদের এ খাতে মাসিক গড় ব্যয় টাকা ৩৫৩৩.৩৩ যা সর্বোচ্চ এবং সহকারি সচিবদের ক্ষেত্রে এই ব্যয় টাকা ৯৬৩.৬৬ যা সর্বনিম্ন। মহিলা কর্মকর্তাগণের মাসিক গড় বিনোদন ব্যয় (টাকা ২৫৬৬.৬৬) পুরুষ কর্মকর্তাদের (টাকা ১৭৬৭.২৫) চেয়ে বেশি।

সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের ধরন

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কমকর্তাগণ সপ্তাহে গড়ে সর্বোচ্চ ৪৭.৭৫ ঘন্টা ঘুমান (সারণী৯)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০.২৭ ঘন্টা দাপ্তরিক কাজে এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৬.৫১ ঘন্টা অবসর। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, গৃহস্থালির কাজ ও ব্যক্তিগত/ পারিবারিক দায় মেটাতে সপ্তাহে গড়ে যথাক্রমে ১৫.৫৫ ঘন্টা, ১৬.৮৫ ঘন্টা ও ১৫.২৪ ঘন্টা ব্যয় হয়। অফিস যাতায়াতের জন্য কর্মকর্তাগণ সপ্তাহে গড়ে ৫.৮১ঘন্টা ব্যয় করেন। পদমর্যাদা বিবেচনায় অতিরিক্ত সচিবদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় ২৯.৬৭ ঘন্টা যা সর্বোচ্চ এবং উপ-সচিবদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় ২৫.১৫ ঘন্টা যা সর্বনিম্ন। পদমর্যাদা নির্বিশেষে সাপ্তাহিক সময় ব্যবহারে একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। নারী-পুরুষ বিবেচনায় গৃহস্থালির কাজে মহিলা কর্মকর্তাগণ যে সময় (সপ্তাহে গড়ে ২১.৬১ ঘন্টা) ব্যয় করেন তা পুরুষ কর্মকর্তাদের তুলনায় (সপ্তাহে গড়ে ১৬.০৯ঘন্টা) বেশি। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় (২৭.৪৭ঘন্টা) মহিলা কর্মকর্তাদের তুলনায় (সপ্তাহে গড়ে ২০.৫৩ ঘন্টা) বেশি।

সারণী ৯। কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের ধরন

সময় ব্যয়ের ধরন	পদমর্যাদা এবং মোট ও গড় অবসর সময় (ঘন্টা)					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
ঘুম	১৩৩ (৪৪.৩৩)	৮৩৭ (৪৬.৫)	১৯১২ (৪৯.০২)	২৬৫০.৫ (৪৭.৩৩)	৭২৩ (৪৮.২)	৬২৫৫.৫ (৪৭.৭৫)
দাপ্তরিক কাজ	১২০ (৪০)	৭২২ (৪০.১১)	১৫৮০ (৪০.৫১)	২২৫১.৫ (৪০.২)	৬০২ (৪০.১৩)	৫২৭৫.৫ (৪০.২৭)
ব্যক্তিগত যত্ন (গোছল, খাওয়া ইত্যাদি)	৫২ (১৭.৩৩)	২৮৭ (১৫.৯৪)	৬২৫ (১৬.০২)	৮৪০ (১৫)	২৩৩ (১৫.৫৩)	২০৩৭ (১৫.৫৫)
গৃহস্থালির কাজ	৪৩ (১৪.৩৩)	৩০১ (১৬.৭২)	৬৪৪ (১৬.৫১)	৯৫৪ (১৭.০৪)	২৬৬ (১৭.৭৩)	২২০৮ (১৬.৮৫)
অফিস যাতায়াত	১৫ (৫)	১০৮ (৬)	২৩০ (৫.৯)	৩০৫.৫ (৫.৪৬)	১০২.৫ (৬.৮৩)	৭৬১ (৫.৮১)
ব্যক্তিগত/পারিবারিক দায় (বাজার করা, সন্তানদের লেখা-পড়ায় সাহায্য করা ইত্যাদি)।	৫২ (১৭.৩৩)	২৮২ (১৫.৬৭)	৫৮০ (১৪.৮৭)	৯১৭ (১৬.৩৭)	১৬৬.৫ (১১.১)	১৯৯৭.৫ (১৫.২৪)
অবসর	৮৯ (২৯.৬৭)	৪৮৭ (২৭.০৫)	৯৮১ (২৫.১৫)	১৪৮৯.৫ (২৬.৬)	৪২৭ (২৮.৪৭)	৩৪৭৩.৫ (২৬.৫১)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জারপ। বন্ধনার মধ্যে গড় সময় ব্যয় দেখানো হয়েছে।

ঢাকা শহরে প্রায় অনুপস্থিত বিনোদন সুবিধাদি

গবেষণাধীন কর্মকর্তাগণ বিনোদনের জন্য ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন যেগুলো ঢাকা শহরে নেই বললেই চলে। এগুলো হলো পার্ক, খেলার

মাঠ, লেক, সবুজ মুক্তাঙ্গন, নিরাপদ পরিবেশ ও গ্রন্থাগার। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুবিধাদি হলো নাটকের জন্য মুক্তমঞ্চ, পরিবহন, ক্লাব ও হাঁটার জন্য ফুটপাথ যেগুলো অনুপস্থিত কিংবা প্রায় অনুপস্থিত। অধিকাংশ কর্মকর্তার মতে ঢাকা শহরের বিদ্যমান পার্ক/মুক্তাঙ্গনসমূহ জনসংখ্যার অনুপাতে যথাযথ নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় পার্ক/মুক্তাঙ্গনের গুরুত্ব গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে।

বিনোদনে অংশগ্রহণে বাধাসমূহ এবং প্রস্তাবিত বিনোদন সুবিধাদি

পদমর্যাদা নির্বিশেষে কর্মকর্তাগণ ৬টি বিষয়কে বিনোদনে বিশেষতঃ বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে- আর্থিক, যানবাহনের অপর্যাপ্ততা, দূষণমুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তাহীনতা, যানজট ও অসামাজিক কার্যকলাপ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বাধাগুলো হলো- সন্ত্রাস, অপর্যাপ্ত সুবিধাদি (পার্ক, মুক্তাঙ্গন ও লেক), সময়ের অভাব ও অনাগ্রহ।

কর্মকর্তাগণ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাদির প্রস্তাব করেছেন (সারণী১০)। এগুলো হলো বিনোদন ভাতা, প্রতি বছর এক মাস বাধ্যতামূলক বিনোদন ছুটি, কমিউনিটি ভিত্তিক গ্রন্থাগার, মহিলা ক্লাব/মহিলা পার্ক ও নতুন পার্ক/মুক্তাঙ্গন/লেক নির্মাণ। অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ হচ্ছে কমিউনিটিভিত্তিক ক্লাব, শিশুদের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক খেলার মাঠ, বিদ্যমান খেলার মাঠসমূহ সংরক্ষণ, বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন, মুক্তমঞ্চ ও শিশুপার্ক/ মিলনায়তন নির্মাণ।

সারণী ১০ ঃ প্রস্তাবিত বিনোদন সুবিধাদি

বিনোদন সুবিধা	পদমর্যাদা					মোট
	অতিরিক্ত সচিব বা সমমান (n=৩)	যুগ্ম-সচিব বা সমমান (n=১৮)	উপ-সচিব বা সমমান (n=৩৯)	সিনিয়র সহকারি সচিব বা সমমান (n=৫৬)	সহকারি সচিব বা সমমান (n=১৫)	(N=১৩১)
১. এক মাসের আবিশ্যক বিনোদন ছুটি	১ (৩৩.৩৩)	৮ (৪৪.৪৪)	২১ (৫৩.৮৫)	১৯ (৩৩.৯৩)	৩ (২০.০)	৫২ (৩৯.৭)
২. বিনোদন ভাতা	১ (৩৩.৩৩)	৯ (৫০.০)	১৯ (৪৮.৭২)	২২ (৩৯.২৮)	৪ (২৬.৬৭)	৫৫ (৪১.৯৮)
৩. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১ (৩৩.৩৩)	২ (১১.১১)	১ (২.৫৬)	৬ (১০.৭১)	৩ (২০.০)	১৩ (৯.৯২)
৪. বিনোদন পরিবহন বই পড়া	১ (৩৩.৩৩)	৪ (২২.২২)	৫ (১২.৮২)	১৭ (৩০.৩৬)	৬ (৪০.০)	৩৩ (২৫.২)
৫. মহিলা ক্লাব/ মহিলা পার্ক	১ (৩৩.৩৩)	৭ (৩৮.৮৯)	১৯ (৪৮.৭২)	১৩ (২৩.২১)	১ (৬.৬৭)	৪১ (৩১.৩)
৬. শিশুদের জন্য কমিউনিটি কেন্দ্রিক খেলার মাঠ	১ (৩৩.৩৩)	৪ (২২.২২)	১৩ (৩৩.৩৩)	৮ (১৪.২৮)	১ (৬.৬৭)	২৭ (২০.৬১)
৭. খেলার মাঠ সংরক্ষণ	১ (৩৩.৩৩)	৩ (১৬.৬৭)	৭ (১৭.৯৫)	৯ (১৬.০৭)	৪ (২৬.৬৭)	২৪ (১৮.৩২)
৮. শিশু পার্ক/ অডিটরিয়াম নির্মাণ	–	২ (১১.১১)	৫ (১২.৮২)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৫ (১১.৪৫)
৯. কমিউনিটিকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার	২ (৬৬.৬৬)	৮ (৪৪.৪৪)	১৮ (৪৬.১৫)	১৪ (২৫.০)	৬ (৪০.০)	৪৮ (৩৬.৬৪)
১০. কমিউনিটি কেন্দ্রিক ক্লাব	–	৪ (২২.২২)	৭ (১৭.৯৫)	১৫ (২৬.৭৮)	২ (১৩.৩৩)	২৮ (২১.৩৭)
১১. নাট্যাভিনয়ের জন্য মুক্ত মঞ্চ	২ (৬৬.৬৬)	৫ (২৭.৭৮)	৭ (১৭.৯৫)	২ (৩.৫৭)	১ (৬.৬৭)	১৭ (১২.৯৮)
১২. নতুন পার্ক/ মুক্তাঙ্গন ও লেক নির্মাণ	–	৯ (৫০.০)	৬ (১৫.৩৮)	২০ (৩৫.৭১)	১ (৬.৬৭)	৩৬ (২৭.৪৮)
১৩. সুইমিংপুল নির্মাণ	–	১ (৫.৫৫)	১ (২.৫৬)	৩ (৫.৩৬)	৩ (২০.০)	৮ (৬.১২)
১৪. বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	–	৩ (১৬.৬৭)	৬ (১৫.৩৮)	৭ (১২.৫)	১ (৬.৬৭)	১৭ (১২.৯৮)
১৫.বেসরকারিকরণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন	১ (৩৩.৩৩)	৪ (২২.২২)	৪ (১০.২৫)	১ (১.৭৮)	২ (১৩.৩৩)	১২ (৯.১৬)

সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ। বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার

মানুষ ঘরে ও বহিরাঙ্গনে বিভিন্ন বিনোদন কর্মকান্ডে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। গৃহ প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে সরকারি কর্মকর্তাগণ নিষ্ক্রিয় বিনোদনে অংশ নেন। অন্য এক গবেষণায়ও গৃহকে ঢাকা শহরবাসীগণ প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Haque, 1995)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন স্থান পার্ক, ক্লাব ও গ্রন্থাগার। সৃজনশীল বিনোদন যেমন ছবি আঁকা ও নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ হয়েছে উপেক্ষিত। যদিও ক্লাব পুরুষ কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন স্থান তথাপি সেখানে নিষ্ক্রিয় বিনোদন যেমন আড্ডা দেয়া ও তাস খেলাই প্রধান। জুয়া খেলা আত্মোন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হলেও পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জুয়া খেলায় অংশগ্রহণের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

গৃহ প্রধান বিনোদন স্থান হিসেবে চিহ্নিত হলেও কর্মকর্তাগণ অবসরে কিছু বহিরাঙ্গন বিনোদনেও অংশ নেন। কিন্তু এই বহিরাঙ্গন বিনোদন সক্রিয় নয়। ঢাকা শহরে পার্ক ও মুক্তাঙ্গনের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া ভীড়, নিরাপত্তাহীনতা ও সুবিধাদির অপর্যাপ্ততা পার্কসমূহের একটি বৈশিষ্ট হলেও পার্কে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বহিরাঙ্গন বিনোদন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদির অভাবের কারণে শারিরীক আয়াসযুক্ত বিনোদন যেমন টেনিস/ব্যাডমিন্টন খেলা, ব্যায়াম/জগিং, বাগান করা ও সাঁতার কম গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে উচ্চ হারে বেতন দেয়া হয় না এমনকি তাঁদের বেতন বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিনোদনে অংশগ্রহণে অর্থ ব্যয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাগণ বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ে সমর্থ নন। আর্থিক সংকট বিনোদনে বিশেষতঃ বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা। এ ছাড়া যানবাহনের অভাব, দুষণমুক্ত পরিবেশ (বায়ু ও শব্দ দূষণ), নিরাপত্তাহীনতা, যানজট, অসামাজিক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাস বহিরাঙ্গন বিনোদনে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশে গৃহস্থালির দায়িত্ব মূলতঃ মহিলারাই পালন করে থাকেন। সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। একই ধরনের দাপ্তরিক কাজের শেষে মহিলা কর্মকর্তাগণ গৃহস্থালির কাজে পুরুষ কর্মকর্তাদের তুলনায় অধিক সময় ব্যয় করেন। অন্যদিকে পুরুষ কর্মকর্তাগণ মহিলা কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি অবসর ভোগ করেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে অবসর সময় কমতে থাকে। পদমর্যাদা ও লিঙ্গভেদে অবসর সময়ের তারতম্য ঘটে। কর্ম সপ্তাহের স্বল্প দৈর্ঘ, প্রযুক্তিগত উন্নতি ও গড় আয়ু বাড়ার কারণে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর জনগণের গড় অবসর সময় বেড়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক গড় অবসর সময় আমেরিকান, ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম (Franklin, 1988 quoted in Leitner et al., 1989:344)। তবে ঢাকা শহরের অন্যান্য চাকিরজীবীদের তুলনায় সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর বেশি (Haque, 1995: 80)।

অবসর সময়ের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। শহরবাসীদের অবসর ও বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সরবরাহ করা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনেরও (DCC) ম্যান্ডেটরী দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(গ) অনুচ্ছেদে অবসর ও বিনোদন অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও সরকারি কর্মকর্তাগণের জীবনে এই অধিকার এখনও অর্জিত হয়নি।

পার্ক ও সবুজ মুক্তাঙ্গন যে কোন শহরের ফুসফুস হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ঢাকা শহরে এগুলো দুর্লভ এবং প্রায় অনুপস্থিত। বহিরাঙ্গন বিনোদন সুবিধাদির দুস্প্রাপ্যতা সরকারি কর্মকর্তাদেরকে অপরাপর নগরবাসীর সাথে গৃহকেন্দ্রিক বিনোদনে বাধ্য করছে। ঢাকা শহরের আয়তন অসংলগ্নভাবে বাড়লেও বিনোদনের মৌলিক সুবিধাদি একই আছে অথবা এমনকি হ্রাস পেয়েছে। পার্ক ও মুক্তাঙ্গন সুবিধা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি নগর পরিকল্পনাবিদগণ কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ উপেক্ষিত হয়ে আসছে। গবেষণাধীন সরকারি কর্মকর্তাগণ এ বিষয়েও মত প্রকাশ করেছেন যে,

ঢাকা শহরের বিদ্যমান পার্ক/মুক্তাঙ্গন জনসংখ্যার অনুপাতে যথার্থ নয়। কাজেই ঢাকা শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় পার্ক/মুক্তাঙ্গনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের অবসর ও বিনোদন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক আলোচনা। নগর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অথচ উপেক্ষিত অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর ও বিনোদন চাহিদার বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে প্রবন্ধে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যোগ্য কর্তৃপক্ষ এতদসংক্রান্ত গবেষণালব্ধ সুপারিশসমূহ বিবেচনা করতে পারেন।

১. **বিনোদন ভাতাঃ** বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনভাতাদি পর্যাপ্ত নয়। অবসর ও বিনোদনের জন্য তাদেরকে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয় যা তাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ সার্কুলারের (বাংলাদেশ গেজেট, জুলাই ৮, ১৯৯৯) মাধ্যমে Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules 1979 অনুযায়ী ১লা জুলাই ১৯৯৯ হতে প্রত্যেক সরকারি কর্মচারি ও কর্মকর্তার জন্য বিনোদন ভাতা চালু করা হয়েছে। এই সার্ভিস রুলস্ অনুসারে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রতি তিন বছরে একবার তার এক মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ বিনোদন ভাতা হিসেবে পাবেন। কিন্তু এই পরিমাণ অর্থ বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি মাসে মূলবেতনের শতকরা ২০ ভাগ অর্থ বিনোদন ভাতা হিসাবে প্রদান করা যায় এবং এই অর্থের নিম্নসীমা প্রতি মাসে টাকা ১,০০০/- (এক হাজার)-এর কম হবে না।

২. **বিনোদন ছুটিঃ** জারীকৃত গেজেট নোটিশ অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর এক মাসের বিনোদন ছুটি বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। সরকারি কর্মকর্তাগণ সরকারি ও রাষ্ট্রীয় ছুটির দিনগুলোতে বিনোদন চাহিদা মেটাতে

সচেষ্ট থাকেন এবং অনেক সময় বিনোদন উদ্দেশ্যে তারা নৈমিত্তিক ছুটির সুবিধা গ্রহণ করেন। সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণকে দাপ্তরিক কাজের চাপের সাথে সাথে নগর জীবনের দুর্ভোগও পোহাতে হয়। কিন্তু চাপ ও দুর্ভোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঢাকা শহরে পর্যাপ্ত বিনোদন সুবিধাদি নেই। বিনোদন ছুটির অপর্যাপ্ততা বা অনুপস্থিতি তাদেরকে শহরের বা দেশের বাইরে বিনোদন চাহিদা মেটাতে বাধার সৃষ্টি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিনোদন ভাতা হিসেবে এক মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থসহ প্রতিবছর এক মাস বাধ্যতামূলক বিনোদন ছুটি প্রবর্তন করা যেতে পারে। এই বিনোদন ছুটি প্রবর্তনের সুবিধার্থে বর্তমানে চালুকৃত দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি কমিয়ে একদিন করা যায়।

৩. **কমিউনিটি কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাঃ** গ্রন্থাগার, অবসর ও বিনোদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দাপ্তরিক কাজের শেষে সরকারি কর্মকর্তাগণ গ্রন্থাগারে অবসর সময় কাটাতে পারেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিটি কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে।

৪. **নতুন মহিলা ক্লাব ও মহিলা পার্ক তৈরীঃ** ঢাকা শহরে মহিলা ক্লাব দুর্লভ এবং মহিলা পার্ক একেবারেই অনুপস্থিত। মহিলা সরকারি কর্মকর্তা ও পুরুষ কর্মকর্তাগণের স্ত্রীদের অবসর বিনোদনের জন্য সরকারি আবাসিক এলাকার কাছাকাছি মহিলা ক্লাব ও পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

৫. **নতুন পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেক তৈরীঃ** ঢাকা শহরে বিদ্যমান পার্কসমূহ নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। পার্কসমূহ ও জনসংখ্যার অনুপাতও যথাযথ নয়। শহরবাসীদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন পার্ক নির্মাণ জরুরী। পার্ক ও মুক্তাঙ্গন শুধু বিনোদনের জন্যই ব্যবহৃত হয় না, এর বৃক্ষরাজি বিষাক্ত গ্যাসসমূহ শোষণের মাধ্যমে নগর পরিবেশকে দুষণ হতে রক্ষা করে। মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনকারী শিরার মত লেক নগর পরিবেশের স্বাস্থ্যসম্মত বিকাশে সহায়তা করে। লেকের প্রয়োজন শুধু বিনোদন ও নগরের সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্যই নয় এটি ঢাকা শহরের প্রাকৃতিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার (Natural drainage system) উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ নগর বাস্তসংস্থানের (Urban ecology) উপর পার্ক/মুক্তাঙ্গন

ও লেকের প্রভাব অপরিসীম। সর্বোপরি ঢাকা শহরবাসীদের মধ্যে পরিবেশ সুস্থ রাখার চেতনা সৃষ্টিতে পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেক যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই নতুন পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেক নির্মাণের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বিদ্যমান পার্ক/মুক্তাঙ্গন ও লেকের সংস্কার ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৬. কমিউনিটি কেন্দ্রিক ক্লাব স্থাপনঃ ঢাকা শহরে বসবাসকারী সরকারি কর্মকর্তাদের সংখ্যা বিবেচনায় বিদ্যমান অফিসার্স ক্লাবসমূহ তাদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। কাজেই সরকারি আবাসিক এলাকার কাছাকাছি নতুন ক্লাব নির্মাণ করা হলে তা অবশ্যই সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের অন্তঃকক্ষ বিনোদনের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

৭. শিশুদের জন্য কমিউনিটি কেন্দ্রিক খেলার মাঠ নির্মাণঃ শিশুদের শরীর ও মনের সুস্থ বিকাশের জন্য খেলার মাঠের কোন বিকল্প নেই। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। কিন্তু বাংলাদেশে শিশুদের বিনোদনের বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাসা বাড়ির পরিবেশ শিশুদের জন্য অনুকূল নয়। শিশুরা অনেকটা কারাগারের মতই গৃহবন্দী থাকে যা তাদের মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। কাজেই তাদের দেহমনের সুস্থতার দিকটি বিবেচনা করে কমিউনিটি কেন্দ্রিক খেলার মাঠ নির্মাণের আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

৮. বিদ্যমান খেলার মাঠসমূহ সংরক্ষণঃ বিদ্যমান খেলার মাঠগুলো ঢাকা শহরের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তা ছাড়া খেলার মাঠসমূহ গ্রাস করে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতা অচিরেই অবশ্যই বন্ধ করা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি বিদ্যমান খেলার মাঠসমূহ সংরক্ষণ করা দরকার।

৯. নাট্যাভিনয়ের জন্য মুক্ত মঞ্চ নির্মাণঃ মুক্ত মঞ্চ নগর সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক যদিও এটি বাংলাদেশে পুরোপুরি উপেক্ষিত। সরকারি কর্মকর্তাসহ নগরবাসীদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটানোর জন্য ঢাকা শহরে কয়েকটি মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করা যেতে পারে।

১০. নতুন শিশুপার্ক নির্মাণঃ ঢাকা শহরে নগণ্য শিশু পার্ক রয়েছে এবং মিউনিসিপ্যাল শিশু পার্কগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন শিশুপার্কসহ অন্য তিনটি বেসরকারী শিশুপার্কই (শ্যামলী, গেন্ডারিয়া ও গুলশানে অবস্থিত) ঢাকার শিশুদের প্রধান বিনোদন স্থান। এই পার্কগুলো কোনভাবেই শিশুদের ন্যূনতম বিনোদন চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। কাজেই নতুন শিশুপার্ক নির্মাণের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।

টীকা ঃ বর্তমান প্রবন্ধটি বিপিএটিসি কর্তক পরিচালিত "Leisure behavior of civil servants : A study on class-I officers working at the Bangladesh Secretariat" শীর্ষক গবেষণার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। প্রবন্ধকার এ বিষয়ে জনাব এ কে এম শামসুল আলম (প্রাক্তন এমডিএস, বিপিএটিসি) ও জনাব ইরতিজা আহম্মদ চৌধুরীর (সিনিয়র সহকারি সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়; বর্তমানে ওএসডি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

তথ্যনির্দেশিকা

Brightabill, C. K. (1960) *The challenge of leisure.* New Jersey : Prentice-Hall.

Brown, R. K. (1985) "Work and leisure". In Adam Kuper and Jessica Kuper (ed.) *The Social Science encyclopaedia.* London : Routledge & Kegan Peul.

Bucher, Charles A. and Richard D. Bucher (1974) *Recreation for Today's Society.* New Jersey : Prentice-Hall.

Clawson, M. and Knetsch, J. L (1966) *Economics of outdoor recreation.* Baltimore: John Hopkins.

Franklin, D. (1986, January/February) "In pursuit of leisure". Science, p. 59.

GOB (1996) *Establishment Manual,* Vol. I. Dhaka : M/O Establishment.

GOB (1999) *Bangladesh Gazette,* Date : 8-7-1999. Dhaka : M/O Finance.

Hall, T. Douglas and Associates (1986) *Career development in organizations.* San Francisco: Josses-Bass.

Haque, M. S. (1995) *Types of outdoor recreation, park uses and planning in Dhaka municipality Area.* M. Phil. Thesis. Department of Geography and Environment. Savar: Jahnagirnagar University.

Haywood, L., Key, F., & Brandon, P. (1989) *Understanding Leisure.* London : Hutchinson.

Iso-Ahola, S. E. (1980) "Toward dialectical social psychology of leisure and recreation". In S. E. Iso-Ahola (ed.), *Social psychological perspectives on leisure and recreation* (pp. 19-37). Springfield, IL : Challis C. Thomas.

Johnston, R. J., Derek Gregory and David M. Smith ed. (1986) *The Dictionary of Human Geography.* 2nd ed. Oxford : Basil Blackwell.

Kaplan, M. (1960) *Leisure in America-a social inquiry.* New York: J. Wiley.

Kelly, J. R. (1982) *Leisure*, Englewoo Cliffs, NJ : Prentice-Hall.

Knock, Carol Wolfed and Kitch, Sally L. ed. (1994) *Women and careers : issues and challenges.* California:Sage.

Leitner et al. (1989) *Leisure enhancement.* New York: The Haworth Press.

Nabi, A. S. M. (1978) *Study of open space in Dacca City.* Dissertation presented to the Development Planning Unit, London:University College.

Noman, A. et al. (1962) *Children's recreation in Dacca as the parents look at it* (Research paper). Dacca: College of Social Welfare & Research Center.

Neulinger, J. (1980) "Introduction". In S. E. Iso-Aloha (ed.) *Social psychological perspectives on leisure and recreation* (pp.5-18). Springfield, IL : Charles C. Thomas.

Neulinger, J. (1981) *The psychology on leisure* (2nd ed.) . Springfield, IL : Charles C. Thomas.

Parker, Stan (1991) "A society of work and leisure" in *World Leisure and Recreation.* Winter 1991. Vol. 33. No. 4 pp. 22-24.

Siddiqui, M. M. R. (1990) *Recreational facilities in Dhaka city : a study of existing parks and open spaces.* MURP Thesis. Dhaka:BUET.

UNIFO (1984). *International human rights instruments of the United Nations* 1948-1982. London:Mansell publishing Limited.

Vannier, Maryhelen (1977) *Recreation Leadership*. Philadelphia : Lea & Febiger.

Weiskopf, D. (1982) *Recreation and Leisure: Improving the quality of life*, Boston : Allyn & Bacon.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৮৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)। ঢাকা ঃ গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
(ষান্মাষিক বাংলা জার্নাল) টাঃ ২০/
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা টাঃ ৪০/-

২। Bangladesh Journal of PublicAdministration
Vol-1, No. 1&2
Vol-2, No. 1&2
Vol-3, No. 1&2 টাঃ ২০/-
Vol-4, No. 1&2 টাঃ ৪০/-
Vol-5, No. 1&2
Vol-6, No. 1&2
Vol-7, No. 1&2

৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service টাঃ ৪০/-

৪। Career Planning in Bangladesh টাঃ ১২০/-

৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh : A Case Study of Gonoshasthaya Kendra টাঃ ৪০/-

৬। Sustainability of Rural Development Projects : A Case Study of RD-1Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৭। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা টাঃ ১২০/-

৮। Sustainability of Primary Education Project: A Case of Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৯। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh টাঃ ১০০/-

১০। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (board binding) টাঃ ১৫০/-
(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (Paper back) টাঃ ১২৫/-

১১। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা টাঃ ৭০/-

১২। Social and Administrative Research in Bangladesh টাঃ ৭০/-

১৩। Problems of Municipal Administration টাঃ ২৮/-

১৪। Bangladesh Public and Senior Civil Servants টাঃ ৫০/-

১৫। প্রশাসনের অভিজ্ঞতা টাঃ ৭০/-

১৬। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ টাঃ ৬/৫০

১৭। সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা টাঃ ৬/৫০

১৮। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি টাঃ ৬/৫০

১৯। Famine Manual টাঃ ৭/-

২০। The Deputy Commissioner in East Pakistan টাঃ ১৬/-

২১। Social Change and Development Administration in South Asia টাঃ ৪৫/-

২২। Hospital Administration টাঃ ১৮/-

২৩। District Administration in Bangladesh টাঃ ২২/-

২৪। Hand Book for the Magistrates টাঃ ১০০/-

২৫। লোক-প্রশাসন সাময়িকী
১ম সংখ্যা-১৫তম সংখ্যা টাঃ ১৫/-

২৬। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি টাঃ ১২৫/-

২৭। Bureaucracy in Bangladesh Perspective টাঃ ৫০০/-

২৮। Limiting the Rule of State Prescription of the World Bank and the Bangladesh Economy টাঃ ১০০/-

২৯। The Assessment of EL. Nino Impacts and Responses টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল। এতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ নবীন লেখকদের বাংলা ভাষায় লিখিত লেখাসমূহ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে লেখা/প্রবন্ধ সাময়িকীতে প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

◆ প্রবন্ধ অবশ্যই স্বরচিত ও মৌলিক হতে হবে এবং অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রহণ করা হবে না। প্রেরিত লেখার সাথে এই মর্মে লেখককে একটি বিবৃতি দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধ সাদা কাগজের (A4 size) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে মুনীর কী বোর্ডে প্রশিকা ফন্টে টাইপকৃত (কম্পিউটার কম্পোজ) হতে হবে। মূল কপিসহ পান্ডুলিপি ২ কপি ও Diskette জমা দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধের উপরে আলাদা কাগজে প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজী শিরোনামসহ লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের অন্য কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

◆ প্রতিটি পান্ডুলিপির সাথে অবশ্যই অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে ইংরেজীতে একটি নির্যাস (Abstract) থাকতে হবে।

◆ প্রবন্ধ অনধিক ৬০০০ (ছয় হাজার) শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; মুদ্রিত ২০ বিশ) পৃষ্ঠা।

◆ প্রবন্ধে পাদটীকা, তথ্য নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রমিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। লোকপ্রশাসন সাময়িকীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়ঃ

বই ঃ Siddiqui, Kamal (1996) *Towards good governmence in Bangladesh*, Dhaka : UPL.

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৯৬) *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র ঃ স্বরূপ ও সমাধান*। ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী।

জার্নাল ঃ Khan, Abar Ali (1980) Decentralization for rural development in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Public Administration* 3(1) : 1-40.

রহমান, মোঃ হাসিবুর (১৯৯৮) প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ঃ কতিপয় কৌশল। *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*। ১২ ঃ ১২৯-১৩৭।

◆ পান্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

◆ মনোনীত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখককে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার জন্য ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।